তালিবানের চিন্তাধারার মৌলিক ভিত্তি

শাইখ আব্দুল ওয়াহহাব কাবুলি হাফিজাহুল্লাহ
[তালিবানদের একজন দায়িত্বশীল আলিম]

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ অনুদিত

তালিবানের চিন্তাধারার মৌলিক ভিত্তি

লেখকঃ শাইখ আব্দুল ওয়াহহাব কাবুলি হাফিজাহুল্লাহ

[তালিবানদের একজন দায়িত্বশীল আলিম]

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ

আল-ফিরদাউস অনুবাদ
Al-Firdaus Translate

সম্পাদকের কথা.....

উসমানি খিলাফতের পতনের পর মুসলিম উম্মাহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ববিহীন ও অভিভাবকশুন্য হয়ে পড়ে। খিলাফতের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর শরিয়ত পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ আহকামসমূহ অকার্যকর ও কিতাবনির্ভর হয়ে পড়ে। ইসলাম ও মুসলিমগণ বিজয়ীর আসন থেকে পরাজিতের আসনে স্থান নেয়। যে ইসলাম এসেছে মানবতাকে সকল ভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে তাওহিদের আলোয় আলোকিত করে জান্নাতের রাজপথ দেখাতে, সেই ইসলাম তার প্রভাব হারিয়ে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। আল্লাহর যমিনে আল্লাহর শরিয়তের পরিবর্তে জায়গা করে নেয় মানবরচিত কুফুরি বিধান। মুসলিমদের ভূমিতে ইসলামের শত্রুরা তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য এমন একদল লোককে ক্ষমতায় বসিয়েছে, যারা নাম-পদবীতে মুসলিম হলেও চিন্তা-চেতনায় কাফিরদের অনুসারী।

মুসলিম উম্মাহর প্রায় সকল ভূমি যখন ক্রুসেডার কাফিরদের দখলে, যখন আমাদের প্রথম কিবলা অভিশপ্ত ইয়াহুদিদের দখলে, যখন দুনিয়ার কোথাও আল্লাহর শরিয়তের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নেই এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে শুরু হয় বরকতময় আফগান জিহাদ। কমিউনিস্ট রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদের ফসল যখন ইসলামের পক্ষে না এসে ইসলামের শত্রুদের ঘরে উঠতে যাচ্ছিল, তখন মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যাকাশে অমানিশার আঁধার যেনো আরো প্রগাঢ় হচ্ছিল। ঠিক এমনই এক মুহূর্তে জিহাদের ভূমি আফগানে উদয় হয় 'তালিবান' নামক এক নতুন সূর্যের, যে সূর্য কুফরের অমানিশার ঘোর আঁধার ছিন্ন করে আল্লাহর শরিয়ত দ্বারা শাসনের মাধ্যমে পুরো দুনিয়াকে নতুনভাবে আলোকিত করে।

মুসলিমরা যখন আল্লাহর শরিয়ত দ্বারা শাসন অনেকটা ভুলেই গিয়েছিল ঠিক এমনই মুহূর্তে হিন্দুকুশের পর্বতমালা থেকে উদয় হওয়া 'তালিবান' নামক সেই আন্দোলন তাওহিদ, জিহাদ, আল্লাহর শরিয়ত কায়েম ও আল-ওয়ালা ওয়ালা-বারার আলো সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছিল। ১৯৯৪ সালে জন্ম হয়ে তালিবান মাত্র ২ বছরের মাথায় আফগানিস্তানের প্রায় ৯০% এলাকা

নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আল্লাহর শরিয়ত কায়েম করে এক নতুন ইতিহাসের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ক্রুসেডার সহযোগীদের আক্রমণে তালিবানরা আফগানিস্তানের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়ে সামরিক দিক থেকে এই ধরণীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ বলে বিবেচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এক দীর্ঘমেয়াদী জিহাদের পরিকল্পনা করেন। এই মহান জিহাদের বরকতে এখন আফগানিস্তানের অধিকাংশ এলাকায় তালিবানদের কালিমা খচিত পতাকা পতপত করে উড়ছে।

২০০১ সালে শুরু হওয়া সেই জিহাদ আজ পত্র পল্লবে সুশোভিত হয়ে সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে। সারা দুনিয়াতে আজ ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে যে চূড়ান্ত লড়াই চলছে, তা তালিবানদের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে চলছে আলহামদুলিল্লাহ্।

১৯৯৪ সালে হঠাৎ জন্ম হয়ে ২ বছরের মাথায় আফগানিস্তানে নিয়ন্ত্রণ নেওয়া তালিবানকে পূর্বে অনেকেই শুধুমাত্র ঘটনার প্রেক্ষাপটে তৈরি হওয়া শক্তি মনে করলেও পরাশক্তি আমেরিকার সাথে ১৮ বছর ধরে লড়াই করে পুনরায় আফগানিস্তানের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে যাওয়া তালিবানকে এখন আর শুধুমাত্র একটি সামরিক শক্তি ভাবার কোনো অবকাশ নেই। বরং তালিবান একটি আন্দোলন ও চিন্তাধারা, যারা ইসলামের হারিয়ে যাওয়া পূর্ণাঙ্গ রূপকে ফিরিয়ে আনার জন্য এক সর্বাত্মক জিহাদে নিয়োজিত রয়েছে।

তালিবানদের চিন্তাধারা নিয়ে পুরো দুনিয়ার মানুষের আগ্রহের খোরাক যোগান দিতে তালিবানদের অফিসিয়াল মাসিক আরবি ম্যাগাজিন 'আস-সমুদ' এর ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮ ও ৪৯ তম সংখ্যায় তালিবানদের একজন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল আলিম শাইখ আব্দুল ওয়াহহাব কাবুলি (হাফি.) الدعائم الأساسية لفكر طالبان অর্থাৎ "তালিবানের চিন্তাধারার মৌলিক ভিত্তি" শিরোনামে একটি ধারাবাহিক আর্টিকেল লিখেছেন। মুসলিম উম্মাহর হক্ব কাফেলা তালিবানদের চিন্তাধারা জানতে এবং এই হক্ব কাফেলার চিন্তাধারার আলোকে নিজেদেরকে গঠন করার প্রত্যাশায় আল ফিরদাউস অনুবাদ উক্ত আর্টিকেল বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সর্বদা হক্বের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার তাউফিক্ব দান করুন। আমিন। (অনুবাদ সম্পাদক)

সূচিপত্র পৃষ্ঠা

১। ভূমিকা---------- ০৬

২। ইসলামের ব্যাপারে আন্দোলনের নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠাতাদের উপলব্ধি---------- ০৮

৩। তালিবানদের চিন্তাধারা ও উপলব্ধি দুষিত না হওয়া---------- ১১

৪। আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসঙ্ঘের নীতি ও সনদের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে অস্বীকৃতি জানানো---------- ১৩

৫। আল্লাহর দ্বীনের প্রতি ঐকান্তিক ঘনিষ্ঠতা এবং বাতিল গোষ্ঠীর সাথে আপোষ না করা... ১৬

৬। রাজা-বাদশাহ ও ধর্মনিরপেক্ষবাদীদেরকে নেতৃত্ব থেকে অপসারণের পর তা আলিম ও দ্বীনদারদের কাছে হস্তান্তর করা---------- ১৮

৭। ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্রকে সর্বাত্মকভাবে প্রত্যাখ্যান করা এবং এটিকে আধুনিক জাহেলিয়াতের দ্বীন হিসাবে গন্য করা---------- ২৬

৮। জাহেলি দলপ্রীতি প্রত্যাখ্যান করে এক কাতারবদ্ধ করা---------- ৩০

৯। তালিবানদের চিন্তাধারায় নারী---------- ৩৮

১০। জিহাদের ব্যাপারে তালিবানদের চিন্তাধারা---------- ৪৮

ক। জিহাদের ব্যাপারে তালিবানদের দৃষ্টিভঙ্গি---------- ৫০

খ। বর্তমান সময়ে জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার ব্যাপারে আকিদা---------- ৫২

গ। তালিবানদের নিকট জিহাদের সুস্পষ্ট লক্ষ্য---------- ৫৫

ঘ। তালিবানদের জিহাদের প্রস্তুতি---------- ৫৬

ঙ। বিশ্বের জিহাদি সংগঠন ও মুজাহিদিনদের ব্যাপারে তালিবানদের দৃষ্টিভঙ্গি------ ৫৯

[বিঃ দ্রঃ এই সূচীপত্র তালিবানদের অফিসিয়াল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত আরবি আর্টিকেলে নেই। আর্টিকেলের বিষয়গুলো একনজরে দেখার সুবিধার্থে শিরোনামগুলো একত্র করে তা সূচীপত্র আকারে সংযোজন করা হয়েছে। __সম্পাদক]

১.ভূমিকা

খ্রিস্টীয় বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে তালিবান আন্দোলনের [ইমারতে ইসলামিয়া] উৎপত্তি হয়েছে, যাতে করে এই আন্দোলন একবিংশ শতাব্দীতে ইসলামি আন্দোলনগুলোর জন্য আলোক দিশারী হতে পারে। মনে হয়, আল্লাহ তা'আলা চাচ্ছেন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর ক্রুসেডার বিশ্ব-পরাশক্তিকে পৃথিবীর অত্যন্ত দুর্বল সামরিক শক্তির মাধ্যমে আঘাত করতে, যাতে মানুষ নতুনভাবে জানতে পারে যে, সত্যিকার শক্তি হচ্ছে ঈমানের শক্তি। এ যুগে অধিকাংশ মানুষ যে বস্তুগত শক্তির উপাসনা করে থাকে তা (আসল শক্তি) নয়। তালিবান আন্দোলনের সূত্রপাত অতঃপর তার শাসনক্ষমতায় আরোহণ এবং মানবজাতিকে এই আন্দোলন কর্তৃক প্রদানকৃত এক নতুন ধরণের শাসনব্যবস্থা, যা যুগ যুগ ধরে মানুষ ভুলে বসেছিল। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে বিচার বা শাসন।

অতঃপর তারা আল্লাহর শরিয়তকে বাস্তবায়ন করেছেন এবং আল্লাহর বান্দাদের জন্য নিরাপত্তা ও প্রশান্তির সৌভাগ্য লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন। তারা জুলুম, বিশৃঙ্খলা এবং জাহেলিয়াতের আইন-কানুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইসলামের দাবিদার তাদের গোলামদের হাত দিয়ে আফগানের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। অতঃপর ক্রুসেডার রাষ্ট্রগুলো তাদের (তালিবানদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে , কুফুরি বিশ্ব এক ধনুক থেকে তাদেরকে তীর বর্ষণ করেছে এবং তাদেরকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করার জন্য কুফর ও নিফাক্কের অধিকারী সকল জাতি-গোষ্ঠী এ যুগে বিশ্ব-ক্রুসেডের নেতৃত্বে এক পতাকার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তবে আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব-কুফুরি সৈন্যবাহিনীর মোকাবেলায় ইমারতে ইসলামিয়াকে সুদৃঢ় থাকার তাউফিক্ব দান করেছেন। আর হ্যাঁ, এখন ইমারতে ইসলামিয়া নতুনভাবে সুস্পষ্ট বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে ইনশাআল্লাহ্।

নিশ্চয়ই তালিবান আন্দোলন তার প্রতিরোধের ধরণ, তার চিন্তাধারা, তার চিন্তাগত ভিত্তি, দুনিয়া এবং মানুষের প্রতি তার ভাবনা এবং অন্যদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে মাপকাঠির

বিবেচনায় একটি অনন্য আন্দোলন। সুতরাং তার কৌশল গ্রহণ এবং পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে তার কী কী চিন্তাগত ভিত্তি রয়েছে যার প্রতি এই আন্দোলন নির্ভর করে ?

এটি এমন একটি প্রশ্ন যার উত্তর জানার জন্য দুনিয়ার মানুষ প্রবল আগ্রহ অনুভব করে। এই প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমি ও চিন্তাভাবনার উৎসগুলো জানতে এবং সেই মানহাজ নিয়ে গবেষণা করতে আহবান করে যা ইমারতে ইসলামিয়ার নেতৃবৃন্দ লালন করে। আর তাতে তালিবানের পরিচিতি, নীতিনির্ধারণ ও শাসন, ইসলামি শরিয়তের ব্যাপারে তাদের উপলব্ধি বা বুঝ এবং ইসলামের ইতিহাসের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় জানা আমাদের জন্য সম্ভব হবে। যেহেতু এই দুর্বল বান্দা (লেখক) তালিবান আন্দোলনের সারিতে দীর্ঘ বহু বছর ধরে কাজ করছে,এই আন্দোলনের উত্থান ও বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় প্রত্যক্ষ করেছে এবং এই আন্দোলনের নেতৃত্ব ও সংশ্লিষ্টদের মনস্তত্ত্ব অনুধাবন করেছে। যেই মানহাজ বা পথের উপর এই আন্দোলনের নেতৃত্ব পড়াশুনা করেছে সে (এই প্রবন্ধের লেখক) স্বয়ং সেই মানহাজ বা পথের উপর পড়াশুনা করেছে এবং এই আন্দোলনের নেতৃত্ব যে পরিবেশ-পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন সে (এই প্রবন্ধের লেখক) ঠিক একই পরিবেশ-পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য সহজ করেছেন এই আন্দোলনেকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার এবং পশ্চিমা মিডিয়ার প্রচারণার ফলে বহিরাগত প্রভাব থেকে দূরে থাকার, যার উপর ভিত্তি করে এই আন্দোলন এবং এর দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে কিছু মানুষের চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে, যার ফলে তারা ইচ্ছাকৃত এই আন্দোলনের ব্যাপারে অবিচার করেছে অথবা অনেকেই এই আন্দোলনের প্রকৃত বাস্তবতা না জেনে এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। সুতরাং এই প্রবন্ধে আমি এই আন্দোলনের চিন্তাগত ভিত্তিসমূহ এবং এই আন্দোলনের মৌলিক ভিত্তিসমূহ এবং প্রশাসন, সরকার, কুফর ও ইসলামের ব্যাপারে তালিবানদের দৃষ্টিভঙ্গি সারমর্ম আকারে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। এসব ভিত্তি জানতে আমি যে পন্থা অবলম্বন করেছি, আমি তাতে পূর্ণ বিশুদ্ধতার দাবি করছি না।

কিন্তু এগুলো হচ্ছে মৌলিক পয়েন্ট এবং এই চিন্তাধারার মোটাদাগের বিষয় যা আমি আন্দোলনের বাস্তবতা, বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের ব্যাপারে এর অবস্থান এবং চলমান বাস্তবতা থেকে উপলব্ধি করেছি। আর সেগুলো হচ্ছেঃ-

২. ইসলামের ব্যাপারে আন্দোলনের নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠাতাদের উপলব্ধি:

নিশ্চয়ই এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও রাজনৈতিক-সামরিক সকল নেতৃবৃন্দ শরিয়তের ইলমের সাথে সম্পৃক্ত। তারা হয় শিক্ষা সমাপ্ত করে বের হওয়া আলিম অথবা কেউ ইলমে শরিয়ত অন্বেষণের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। তাদের কাছে জ্ঞানার্জনের উৎস হচ্ছে শরিয়তের সেসব প্রমাণাদি যেগুলো এই উম্মতের সালাফদের যুগে ছিল। তারা তা সেসব কিতাবাদিতে অধ্যয়ন করেন যা অতীত যুগের ইসলামের আলিমগণ লিপিবদ্ধ করেছেন, যেগুলোতে সেসময়ের মানুষেরা একনিষ্ঠভাবে দ্বীনকে অনুধাবন করতো, যা শেষ যুগের আলিমদের পুস্তকসমূহ ও আলোচনায় ইসলামি চিন্তাধারার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে, এমন বিকৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও অনুপ্রবেশকারী অপবিত্র চিন্তাধারা থেকে মুক্ত। সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমাগোষ্ঠী ও ইসলাম বিদ্বেষী প্রাচ্যবিদদের আধিপত্য বিস্তারের পর তারা ইসলামি বিশ্বের দেশসমূহের পাঠদান সিলেবাসে এসব পুস্তক রচনা করেছিল। এসব পুস্তকের নেতিবাচক প্রভাব ছিল, এগুলো ইলমে শরিয়তকে পাশ্চাত্যের রুহ বিবর্জিত পন্থায় পেশ করেছিল। এসব শিক্ষার মাধ্যমে দ্বীনি চিন্তাধারা ও শর'য়ি আহকাম থেকে যা শিক্ষা গ্রহণ করতো, তার ভিত্তিতে আমল করার কোনও প্রয়োজন অনুভব হতো না। বরং তা ইলমে শরিয়তকে উত্তরাধিকারের মতো একটি বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করেছে, যাকে প্রাচ্যবাদ প্রভাবিত অনেক চিন্তাধারা অপবিত্র করেছে। ফলে তা শরিয়তের বিশুদ্ধতা এবং তা বাস্তবায়নে কল্যাণের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করেছে। ইসলামকে শরিয়ত ও মানুষের জন্য জীবনব্যবস্থা হিসেবে বিশ্বাস করে না এমন সরকারগুলোর পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠিত সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ আলিমদের মধ্যে এই অংশকে উৎপাদন করেছে। বরং এসব সরকার চেষ্টা করে ইসলামকে মানুষের জীবন

থেকে দূরে সরিয়ে দিতে, যাতে তার স্থান দখল করে মানুষের তৈরি আইন ও পশ্চিমা আইন। তারা চায় না, মানুষ খালেসভাবে পশ্চিমা চিন্তাধারার প্রভাবমুক্ত হয়ে ইসলামকে অনুধাবন করুক, যাতে সত্যিকার ইসলাম থেকে তাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য মানুষ তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে।

আর তালিবান ইসলামের এই বিকৃত চিন্তাধারা থেকে মুক্ত। কেননা তারা বিশুদ্ধ ইসলামি মাদরাসা ও মসজিদসমূহে ইসলাম শিক্ষালাভ করেছে, যেসব প্রতিষ্ঠানের উপর দালাল সরকারগুলো আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। ফলে তাদের মধ্যে সালাফদের দ্বীন ও শরিয়তের উপলব্ধির নিকটবর্তী সঠিক মানহাজ ও বিশুদ্ধ ইলম গোড়াপত্তন লাভ করেছে। সন্দেহ নেই যে, এসব মাদরাসায় প্রশাসন পরিচালনা, সিলেবাসের আধুনিকায়ন এবং জ্ঞান বিতরণের পন্থায় অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। কখনো কখনো ইলমের ক্ষেত্রে নতুন করে প্রবেশ করেছে এমন কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার মতো ত্রুটি রয়েছে। কিন্তু এসকল ত্রুটি-বিচ্যুতি শরিয়তের উদ্দেশ্য ও সালাফদের পন্থায় ইসলামকে অনুধাবন করতে এই সিলেবাসের পাঠ্যক্রমকে বাঁধা প্রদান করে না।

পশ্চিমা চিন্তাধারায় প্রভাবিত সিলেবাস থেকে মুক্ত হওয়ার প্রভাব হচ্ছে, দ্বীনি বিশুদ্ধ প্রতিষ্ঠান থেকে বের হওয়া ফারেগদের (স্নাতকদের) চিন্তাধারা ও নীতি এবং (পশ্চিমা চিন্তাধারায় প্রভাবিত ব্যক্তিরা) তাদের পশ্চিমা প্রভুরা তাদের নিজস্ব পন্থায় যে চিন্তাধারা ও নীতি প্রতিপালন করেছে তার মধ্যে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা বা পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলাম ও তার আন্তরিক অনুসারীদের চাহিদা এবং কুফর ও তার অনুসারীদের মাঝে কোনো যোগাযোগের স্থান নেই। আর এটিই পশ্চিমা ও কুফরের মোড়লদেরকে তালিবানদের বিরুদ্ধে রাগান্বিত করেছে। যেহেতু তারা (তালিবানরা) রাজনীতি, শাসন, আইন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে পশ্চিমা নীতির অনুসরণ করে না।

অতঃপর পশ্চিমারা তালিবানের চিন্তাধারা ও ইসলামের ক্ষেত্রে তাদের উপলব্ধির বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক বিশ্বযুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে। আর তা শুধুমাত্র সামরিক যুদ্ধে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং

তারা তালিবানদের বিরুদ্ধে শিক্ষা, মিডিয়া, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রে সর্বাত্মক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এসব ক্ষেত্রে শত শত মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে এসব অঞ্চলে বিভিন্ন রূপে ছড়িয়ে পড়া তালিবানদের চিন্তাধারার প্রভাবকে নির্মূল করার জন্য। এই ভয়ে যে, পশ্চিমারা ইসলামি বিশ্বের মুসলিমদের মন-মানসে যেসব মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করেছে, তালিবানদের চিন্তাধারা পশ্চিমা সেসব মতবাদকে নিঃশেষ করে দিবে।

সুতরাং আফগানিস্তানে ইসলামি ইমারতের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ শাইখ উসামা বিন লাদেন হাফিঃ*** অথবা অন্য কাউকে বন্দী করার যুদ্ধ নয় বরং তা সত্যিকার ইসলামি চিন্তাধারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, যে চিন্তাধারা পশ্চিমা ক্রুসেডার এবং ইসলামি বিশ্বে তাদের পা-চাটা গোলাম শাসকদের সাথে কোনো ধরণের আপোষ করে না।

তালিবানের চিন্তাধারা এবং তাদের নীতিগত অবস্থান নিয়ে পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, তাদের নিকট ইলমে শরিয়ত শুধুমাত্র সার্টিফিকেট অর্জন, পেশা ও ইলমি গৌরবের জন্য নয়। নিশ্চয়ই এটি এমন এক দ্বীন, যা চিন্তাধারা থেকে আমলে বাস্তবায়নকে আবশ্যক করে, তা যত কুরবানি-ই দাবি করুক না কেনো।

আর এতে কোনো সন্দেহ নেই, শরিয়ত বাস্তবায়নের জন্য অনেক বাঁধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা দূর করার প্রয়োজন রয়েছে, যেসব প্রতিবন্ধকতা মুসলিম ও ইসলামের মূলনীতির আলোকে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাঝে দাঁড় করানো হয়েছে।

যখন এসব প্রতিবন্ধকতা অপসারণে দলিল-প্রমাণের শক্তি কোনো কাজে আসবে না, তখন অবশ্যই সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। আর আফগানিস্তানে শাসনের ক্ষেত্রে তালিবানরা এটি-ই করেছিল। আর এখনো তারা তাদের মহান রবের শরিয়ত থেকে যা জেনেছে তা বাস্তবায়নের জন্য রক্ত ও জান কুরবানি পেশ করছে। আর এটি-ই তালিবানদেরকে সেসব ব্যক্তিদের থেকে আলাদা করেছে, যারা ইলম ও তা'লিমের ক্ষেত্রে পশ্চিমা ধাঁচের একাডেমিক পদ্ধতিতে জ্ঞান অর্জন করছে। জামি'আ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলিমগণ অনুসন্ধান ও গবেষণার

জন্য ইলমে শরিয়ত শিক্ষা দিচ্ছে। আর তালিবানরা হচ্ছে মসজিদ ও মাদরাসার সন্তান। তারা ইলমে শরিয়ত শিক্ষাগ্রহণ (ও শিক্ষাদান) করছে আমল করা ও তা বাস্তবায়নের জন্য।

*** [যেহেতু এই আর্টিকেলটি শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহ.জীবিত থাকতে ২০১০ সালে প্রকাশিত হয়েছে, তাই উনার নামের সাথে হাফি.লেখা হয়েছে____ অনুবাদক]

৩. তালিবানদের চিন্তাধারা ও উপলব্ধি দুষিত না হওয়া

যা পশ্চিমা সভ্যতা চিন্তাধারা, চালচলন, রীতি-নীতি ও শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে। নিশ্চয়ই ইসলামি দেশ ও জাতিসমূহের উপর চেপে বসা শাসনব্যবস্থা ও ত্বগুত সরকারগুলো, যার সিংহভাগ-ই পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের পথ অবলম্বন করে এসেছে, তারা ইসলামি দেশসমূহে যেসব মাদরাসা বাঁ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে তাতে এই প্রজন্মকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার পর অথবা পশ্চিমা দেশে শিক্ষার জন্য শিক্ষাবিষয়ক প্রতিনিধিদল প্রেরিত হওয়ার পর, যাতে তারা পশ্চিমাদের হাতে এবং সবধরনের ইসলামি প্রভাবমুক্ত পরিবেশে শিক্ষালাভ করতে পারে, ফলে তারা সাম্রাজ্যবাদীদের প্রস্থানের পর ভবিষ্যৎ ইসলামি বিশ্বের শাসক হিসেবে তাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে পারে।

তারা সেই সিলেবাসে শিক্ষাদান করছে, যা পশ্চিমারা তাদের মগজ ধোলাই করার জন্য তৈরি করেছে। ফলে দ্বীনি বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন পশ্চিমা দর্শনের বস্তুগত ও আল্লাহদ্রোহী দর্শনের দ্বারা তাদের উপলব্ধি ও চিন্তাশক্তি দুষিত হয়ে গেছে। আর তারা শাসন, রাজনীতি ও সরকারব্যবস্থার ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছে। তাদের প্রবৃত্তিসমূহ দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান ও দ্বীনের প্রতি আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে কুফুরি শিক্ষাকে পরিতৃপ্তির সাথে গ্রহণ করেছে। এই প্রজন্ম পশ্চিমা রঙ্গে সম্পূর্ণরূপে রঙ্গিন হয়ে পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো পরাধীন ইসলামি দেশে তাদের হাতে শাসনক্ষমতা

সমর্পণ করেছে। অতঃপর তারা তাদের শাসনব্যবস্থা ও প্রশাসনে পশ্চিমা আল্লাহদ্রোহী চিন্তাধারা ও পন্থাকে বেছে নিয়েছে এবং তারা শাসনক্ষমতা ও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শরিয়তকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বরং তারা শরিয়তের বিরুদ্ধে চরম বিদ্রোহ করেছে। আর তারা মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে এমন নতুন কাঠামো উদ্ভাবন করেছে, যাতে ইসলামি বিশ্বের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সাম্রাজ্যবাদীরা যে ছক তৈরি করেছিল, সেই মানদণ্ডে পশ্চিমা ধাঁচে এই প্রজন্ম গড়ে উঠে। ফলে তাদের (ইসলামি বিশ্বের) কিছু অংশ নাস্তিক্যবাদী সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে কায়েম করেছে এবং কিছু অংশ শরিয়তের বিচারব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যানকারী উদার ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অতঃপর তারা তাদের আমদানি করা মতবাদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অত্যাচার,নির্যাতন ও বন্দিত্বের অনুশীলনের পথ ধরে ইসলামি বিশ্বের জনতাকে এক বিপর্যয়ের পর আরেক বিপর্যয়ের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছে। আর এভাবেই মাত্র এক শতকেরও কম সময়ের মধ্যে ইসলামি বিশ্ব তার স্বাধীন ইসলামি বৈশিষ্ট্য হারিয়ে পশ্চিমের লেজে পরিণত হয়েছে। ফলে ইসলাম তার নিজ ঘরে অপরিচিত হয়ে গেছে, যেমনিভাবে মানবরচিত আইন ও মতবাদ দ্বারা শাসিত মুসলিমরা নিজ ভূখণ্ডে অপরিচিত হয়ে গেছে।

আর বিভিন্ন জাতি ও জনগণের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে তালিবানদের চিন্তাধারা ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, কৌশলী, প্রয়োগতাত্ত্বিক, উপকার ও অধিকতর কল্যাণের যুক্তি এবং অত্যাচার ও প্রতারণার ভাষায় পশ্চিমা দর্শনের নব উদ্ভাবিত বিপর্যয়ের দ্বারা দুষিত হয়নি। বরং তালিবানরা চিন্তাধারা, আদর্শ, তাদের জীবন দর্শন এবং অন্যদের সাথে মু'আমালাতসহ সকল ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়ত থেকে (বিধান) গ্রহণ করেছে। তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়তের সেসব বিধানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছে যেগুলো ধর্মনিরপেক্ষতা হত্যা করেছিল (অর্থাৎ বিলুপ্ত করেছে)। আর তালিবানরা তাদের বিরোধিতা কিংবা তাদের বিরুদ্ধে কথিত বিশ্ব সংস্থাগুলোর ঐক্যমত হওয়াকে কোনো পরওয়া করেনি, যে পর্যন্ত ইসলাম তা করার নির্দেশ দিয়েছে। তালিবানরা মানবরচিত সকল আইন-কানুন বাতিল করে দিয়েছে, যেগুলো পূর্ববর্তী ধর্মনিরপেক্ষ সরকারগুলো আমদানি করেছিল। যখন পশ্চিমা জগৎ দেখল

যে, তালিবানরা মুসলিম ও বিশ্ববাসীর সামনে এমন এক ভিন্নতর চিন্তাধারা ও আদর্শ পদ্ধতি পেশ করছে, যা মানুষকে পশ্চিমা বস্তুবাদী মানদণ্ডের অন্ধকার থেকে মুক্ত করে ইসলামের আলোর দিকে, ইসলামি শরিয়তের ন্যায়বিচারের দিকে, পশ্চিমা কপট রাজনীতি থেকে বিশুদ্ধ ইসলাম ও ইসলামের উন্নত শিক্ষার স্বচ্ছতার দিকে এবং দালাল সরকারগুলোর পথভ্রষ্টতা থেকে বের করে উম্মতের সালাফদের মানহাজের দিকে পথপ্রদর্শন পেশ করছে, তখন পশ্চিমারা যে মতবাদ মুসলিম বিশ্বে প্রসারের জন্য কাজ করছিল এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত মুসলিমদেরকে এই মতবাদের কার্যকারিতার ব্যাপারে আশ্বস্ত করছিল, (তালিবানদের) একাজের মধ্যে তাদের আদর্শের বিরুদ্ধে বিরাট হুমকি দেখতে পেল।

একারণে পশ্চিমারা তালিবানদের থেকে মানুষকে বিমুখ করার জন্য তালিবানদের চিন্তাধারা ও তালিবান সরকারের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগের তীর এবং চক্রান্ত আরোপ করতে শুরু করল, যাতে করে অন্যান্য ইসলামি দেশসমূহে মুসলিমগণ তালিবানদের অনুসরণ না করে। আর পশ্চিমা আইন-কানুন তাদের অধিবাসীদের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে নির্দিষ্ট ছকে বেঁধে দিয়েছে এবং সেক্ষেত্রে পশ্চিমা উপলব্ধি মানুষের বিবেক ও চিন্তাধারাকে কলুষিত করে ফেলেছে।

৪. আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসঙ্ঘের নীতি ও সনদের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা বা বিচার-ফায়সালা করতে অস্বীকৃতি জানানো বা প্রত্যাখ্যান করা:

বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইনের নামে যা আছে এবং জাতিসঙ্ঘের সকল শাখা, বেসামরিক ও সামরিক প্রশাসন তা মূলত: তাদের কর্তৃত্ব ও সম্প্রসারণবাদী-সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে আড়াল করা এবং কতিপয় শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অন্যান্য দুর্বল রাষ্ট্র যার মধ্যে ইসলামি দেশগুলোও রয়েছে, তাদের উপর রাজনৈতিক ও বিচার সংক্রান্ত কর্তৃত্ব বাস্তবায়ন করার জন্য বাহ্যিক আচ্ছাদন মাত্র। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক আইনের নামে এসব ব্যবস্থার জন্য

বিভিন্ন আইন-কানুন ও সনদ তৈরি করে এমন বিস্তৃতরূপে অন্তর্ভুক্ত করেছে যাতে তাদের অপরাধী আইনের মাধ্যমে সেসব রাষ্ট্রের কল্যাণ এবং তাদের শক্তিগুলোকে শৃঙ্খলিত করার শর্তে এই আইনের শ্রেষ্ঠত্ব অন্য রাষ্ট্রগুলোর উপর আরোপিত করা যায়। বিগত ৬০ বছরের বেশি সময় ধরে পৃথিবী তা প্রত্যক্ষ করছে। আর সত্যিকার অর্থে এসব আইন হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো দুর্বল রাষ্ট্র ও জাতির অধিকারের ক্ষেত্রে যে অপরাধ সংঘটিত করেছে, তা বাস্তবায়নের জন্য একটা হাতিয়ার মাত্র। যেনো এসব আইন-কানুন সকল মাজলুম জাতির উপর বাস্তবায়ন করাকে আবশ্যক করে দিতে পারে।

পশ্চিমারা এসব আইনকে পবিত্রতার উচ্চ মহিমার বেষ্টনী দ্বারা মোড়ক দিয়ে এমন রূপ দিয়েছে যে, তার সমালোচনা কিংবা বিতর্ক কিংবা তার রচনা নিয়ে পুনরায় চিন্তাভাবনা করা কিংবা তার মূল বিষয়বস্তু পরিবর্তন করা গ্রহণযোগ্য নয়। যেনো এসব (মানবরচিত কুফরি) আইন মানবজাতির কল্যাণের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর আম্বিয়াদের (আ.) উপর যে পবিত্র ও আসমানি শিক্ষা নাযিল করেছেন তার উপরে মর্যাদা দান করা হয়েছে। যেহেতু ইসলামি বিশ্বের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সরকারগুলো পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের তৈরি এবং এসব রাষ্ট্রের কার্যাবলী পরিচালনা করে এমন সব মানুষ যারা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল সাঃ এর সাথে খেয়ানত করেছে এবং তারা সেসব সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের প্রতি নিষ্ঠার সাথে অনুগত থেকেছে, যেসব রাষ্ট্র তাদের ক্ষমতায় আরোহণ ও ক্ষমতায় টিকে থাকাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এসব শাসকেরা সেসব আইন ও ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনের [আন্তর্জাতিক !!?] সনদের প্রতি এমনভাবে ঈমান (বিশ্বাস) এনেছে, যেভাবে মুসলিমরা ইসলামের প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) আনে। এসব দালাল ব্যক্তিরা (শাসকেরা) এসব (আন্তর্জাতিক কুফরি) আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপরিচালনা বা বিচার-ফায়সালা করায় এমনভাবে নিবেদিত থেকেছে যেভাবে মুসলিমরা তাদের জীবনে বিচার-ফায়সালা করা ও তা বাস্তবায়নে আল্লাহর শরিয়তের প্রতি নিবেদিত থাকে।

আর এভাবেই পশ্চিমা আইনি আধিপত্য ইসলামি বিশ্বের দেশসমূহে আমাদের জীবনের উপর পরিচালনা করছে। এসব আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কিংবা এসব আইনের মাধ্যমে বিচার-

ফায়সালা প্রত্যাখ্যান করা মহা অপরাধ হিসেবে গণ্য হচ্ছে। এসবের বিরোধিতাকারী রাষ্ট্র ও জাতিকে এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়ন এবং উক্ত দেশের সরকারের পতন ঘটানো, তাদের সম্পদ দখল করার পরিণতি ভোগ করতে হচ্ছে, যে পর্যন্ত না উক্ত আইন-কানুনের প্রতি স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় আনুগত্য না করবে।

কিন্তু তালিবানরা এই উপাখ্যান বাতিল করে দিয়েছে এবং তারা সুস্পষ্টভাবে এসব আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। আর তারা তাদের সর্বোচ্চ আওয়াজে আহবান করছে যে, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক, প্রথম ও শেষ সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর শরিয়তের শাসন হওয়া আবশ্যক। তারা তাদের মূলনীতি ও ঈমানের উপর দৃঢ়তার সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকেছে এবং শক্তিশালী ঝড়ের মোকাবেলায়ও তা টলেনি। নিশ্চয়ই ইজ্জত একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল সা. এবং মুমিনদের জন্য কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।

আর তালিবানদের নিকট এসব চিন্তাগত ভিত্তিসমূহ কখনো অর্থহীন প্রতীকের সীমায় আটকে থাকেনি, যেভাবে ইসলামের সাথে যুক্ত বিভিন্ন দল এগুলোকে তুলে ধরে বরং তাদের আমল এই চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপায়িত করেছে। যখন তারা আন্তর্জাতিক সনদের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা কিংবা যাবতীয় কার্যাবলীর ক্ষেত্রে শরিয়তের উৎসকে আঁকড়ে ধরার পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে, তারা (তালিবানরা) আন্তর্জাতিক আইনের সনদের প্রতি আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে বা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা তখন ইসলামকে আঁকড়ে ধরেছে। যদিও ইসলামকে আঁকড়ে ধরার জন্য তাদের সরকার ও শাসনের পতন হয়েছে, যে শাসনকে তারা বিরাট কুরবানির পর তাদের রক্ত ও খুলির বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা করেছিল।

কেননা তালিবানের নিকট তাদের শাসনের লক্ষ্য ছিল আল্লাহর দ্বীনকে সুউচ্চে তুলে ধরা। আর এখনো পর্যন্ত শাসনব্যবস্থার মধ্যে যেখানে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী না থাকবে, পশ্চিমাদের সাথে দর কষাকষির জন্য সেখানে তালিবানদের দৃষ্টিতে শাসনের কোনো মূল্যই নেই। কিন্তু এসকল বিষয় ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হলে কোনো নীতি বা আন্তর্জাতিক সনদকে সমর্থন করতে নিষেধ করে না।

এই উপলব্ধি হচ্ছে স্বয়ং সেই উপলব্ধি, যা রাসূল সাঃ তাঁর সাহাবিদেরকে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের ক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়ার সময় বারংবার উচ্চারণ করেছেন। রাসূল সাঃ মক্কায় জাহেলিয়াতের সাথে অংশীদার হয়ে রাষ্ট্রপরিচালনা করতে রাজি হননি। যদিও মক্কার অধিবাসীরা রাসূল সাঃ কে প্রধান করে রাষ্ট্রপরিচালনা করতে রাজি ছিল এই শর্তে যে, তিনি রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের জাহেলিয়াত, আইন-কানুন এবং তাদের বাপ-দাদাদের থেকে প্রাপ্ত রীতিনীতির দ্বারা শাসনকে স্পর্শ করবেন না অর্থাৎ এগুলোকে বাদ দিবেন না।

নিশ্চয়ই আমাদের যুগে এধরণের উপলব্ধি বা বুঝকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা তালিবানদের এক বিরাট কৃতিত্ব, যে যুগে শাসনক্ষমতার নেতৃত্বে টিকে থাকার জন্য শাসকেরা কুফরি আইন-কানুনের প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ করতে দৌড়াদৌড়ি করে থাকে।

৫। আল্লাহর দ্বীনের প্রতি ঐকান্তিক ঘনিষ্ঠতা এবং বাতিল গোষ্ঠীর সাথে আপোষ না করা-

এখানে অনেক ইসলামি আন্দোলন ও দল আছে যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য আল-ওয়ালা বা ঘনিষ্ঠতা দাবি করে যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে কোনো কষ্ট বা বিপদ না আসে, কিন্তু যেইমাত্র কঠিন কষ্ট ও পরিষ্কারকারী বিপদ (যে বিপদের মাধ্যমে বাতিল থেকে হক আলাদা হয়ে যায়) এসে যায়, তৎক্ষণাৎ দ্রুতই তারা আপোষকামিতা ও দরকষাকষির দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাদের দুনিয়াবি অর্জন সুরক্ষার জন্য বাতিল গোষ্ঠীকে ইসলামি নীতিমালার মানদণ্ডের উপরে স্থান দেয়। আর এর চেয়ে নিকৃষ্টতর হচ্ছে যে, সেসব দল অত্যন্ত অবমাননাকর উপায়ে শত্রুদের সাথে জোট গঠন করে এবং আল্লাহর তা'আলার দ্বীনের পক্ষের মুজাহিদ ও প্রতিরোধকারীদের বিরুদ্ধে অভ্যন্তর থেকে যুদ্ধের ফ্রন্ট খুলে। আর তারা মুজাহিদদেরকে সন্ত্রাস, চরমপন্থা, ইলমের স্বল্পতা এবং দ্বীনের আসল মর্ম উপলব্ধি না করার অপবাদ দেয়। তারা জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে স্বয়ং সেসব পরিভাষা ও বৈশিষ্ট্য বারবার উচ্চারণ করে, যেগুলোর প্রচলন ঘটানোর জন্য শত্রুরা চেষ্টা করে থাকে। ইসলাম নিয়ে ব্যবসা করা এসব

দল ও আন্দোলনের পক্ষ থেকে আমাদের জাতি কতই না কষ্ট ভোগ করেছে ? কত ইসলামি উপলব্ধি-ই না এসব দলের কর্মকাণ্ড ও তাদের কলঙ্কজনক অবস্থানের মাধ্যমে বিকৃত হয়েছে? ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত কত জামা'আত ও দলকেই আমরা দেখেছি, মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও চরমপন্থার অভিযোগ আরোপ করে এসব দল বিশ্ব ক্রুসেডারদের জোটে যোগ দিচ্ছে?

আর আল্লাহর অনুগ্রহে তালিবান আন্দোলন প্রথম দিন থেকে-ই ইসলামের প্রতি আল-ওয়ালা বা ঘনিষ্ঠতাকে একনিষ্ঠভাবে বিশুদ্ধ করে নিয়েছে। তারা শাসন ক্ষমতায় পৌঁছার জন্য সেসব বিকৃত জামা'আত ও দলের সাথে আপোষ করেনি। অতঃপর ইসলামি শরিয়ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে তারা তাদের এই আল-ওয়ালা বা ঘনিষ্ঠতায় নতুনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকেছে। অথচ শরিয়ত বাস্তবায়ন দীর্ঘকাল যাবত বন্ধ করে রাখা হয়েছিল।

আর তালিবানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, তাদের প্রতি অপবাদ আরোপ এবং তাদের কাজে সংশয় প্রকাশ সত্ত্বেও এই মহিমান্বিত কাজটি তালিবানরা প্রতিষ্ঠা করেছে, যা সারা বিশ্বে ইসলামপন্থীরা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আর এর মাধ্যমে আমরা তালিবানের শরিয়ত বাস্তবায়নে কোনো ভুল ও স্খলন থেকে কিংবা তাদের দলে মন্দ সমর্থক থাকা থেকে মুক্ত হওয়া দাবি করছি না। এক্ষেত্রে এটি অন্যান্য আন্দোলনের অনুরূপ, যেখানে বিভিন্ন উদ্দেশ্যের অধিকারী ও পদমর্যাদার আকাঙ্ক্ষী থাকতে পারে। কখনো এমন হতে পারে যে, পূর্ববর্তী জিহাদি সংগঠনের অধীন থেকে অনুপ্রবেশ করা ব্যক্তিদের ইসলামের প্রতি ওয়ালা বা ঘনিষ্ঠতা আমেরিকান ডলারের সামনে টলে গেছে। কিন্তু যখন-ই পরীক্ষা এসেছে এসব লোকেরা তালিবান আন্দোলনকে অপমানিত করেছে, অতঃপর (তালিবান) আন্দোলন তাদেরকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এবং তাদের জন্য তালিবানদের সারিতে কোনো স্থান নেই।

৬. রাজা-বাদশাহ ও ধর্মনিরপেক্ষবাদীদেরকে নেতৃত্ব থেকে অপসারণের পর তা আলিম ও দ্বীনদারদের কাছে হস্তান্তর করাঃ-

তালিবান আন্দোলন এই দ্বীনের (ইসলাম) চেতনা ও তাঁর গৌরবময় ইতিহাস অনুধাবনের মধ্য দিয়ে এটি বিশ্বাস করে যে, মুসলিম উম্মাহকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়ার হক হল উলামায়ে দ্বীন ও নবীদের উত্তরসূরিদের। এব্যাপারে দ্বীন ইসলাম অত্যন্ত স্পষ্টভাবে হুকুম দিয়েছে। এর দৃষ্টান্তের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে। কেননা তিনি নবুয়াতের মর্যাদাসম্পন্ন আসনে আসীন থেকে ইসলামি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন এমন ব্যক্তি যিনি একাই রাষ্ট্র পরিচালনা, সামরিক, অর্থনৈতিক ও উম্মাহকে শরিয়ত শিক্ষা দেওয়ার কাজ পরিচালনা করতেন। তিনি ছিলেন এমন ব্যক্তি যিনি মুসলিম উম্মাহকে তাদের প্রতিপালকের দ্বীন শিক্ষা দেওয়া ও মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনার পাশাপাশি ইসলামি রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক নীতির জন্য পত্র লিখতেন।

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর উম্মাহকে নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়টি এমন ব্যক্তির উপর অর্পণ করা হয়, যিনি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী ও ইসলামি শরিয়তের প্রাণসত্ত্বার ব্যাপারে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত। আর তিনি হলেন আবু বকর সিদ্দিক রাদি. (আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন) আর এভাবেই নেতৃত্ব একজন আলিম থেকে আরেকজন আলিমের কাছে হস্তান্তর হতে লাগলো এবং তাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মধ্য দিয়ে ইসলামি রাষ্ট্রের ভূখণ্ড প্রশস্ত হতে লাগলো ও ইসলামের দাওয়াত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল।

খাইরুল কুরুন বা সর্বোত্তম যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর মানুষ দ্বীন শিক্ষা থেকে সরে যাওয়ার কারণে পতনের যামানা শুরু হয় এবং উম্মাহ রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব অধিকাংশ সময় এমন সকল লোকদের উপর আরোপিত হয়, যাদের রাষ্ট্র পরিচালনা তাদের প্রতিপালকের শরিয়ত দ্বারা করার চেয়ে তাদের মনগড়া মতই বেশী হয়, ফলে তখন শরিয়ত পালনের ব্যাপারে শিথিলতা দেখা দেয়, যা উম্মাহর শক্তি দুর্বল হওয়ার কারণ হয়। অতঃপর মুসলিমরা

অনেক দেশ হারিয়েছে এবং উম্মাহ বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় ভোগ করেছে। এই লাঞ্ছনার কর্দমতা থেকে ঐ সকল নেতৃবর্গ মুসলিম উম্মাহকে বের করে নিয়ে এসেছেন, যারা সকল ক্ষেত্রে শরিয়ত দ্বারা শাসন পরিচালনা করেছেন। তারা শরিয়ত দ্বারা শাসনকে স্বস্থানে ফিরিয়ে এনেছেন। তারা হলেন আইয়ুবী, গজনবী, মুজাফফার কুতুয ও অন্যান্যরা যাদের সাথে শরিয়তের ইলমের পাথেয় ছিল অথবা যারা আলিমদের সাথে থাকার কারণে উলামায়ে ইসলামের ইলমের দ্বারা আলোকিত হয়েছেন।

বড় আফসোসের বিষয় হচ্ছে, ইতিহাসের সেই উজ্জ্বল ভূমিকা দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়নি এবং শাসন-কর্তৃত্ব স্বৈরাচারী শাসকদের হাতে ফিরে আসে, যারা দ্বীনের উপর নফসের চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়। তারা আলিমে দ্বীন ও দ্বীনদার লোকদেরকে নির্যাতন করেছে এবং শরিয়তের আলিমদেরকে রাষ্ট্রপরিচালনা ও নেতৃত্বের অঙ্গন থেকে অপসারণ করার চক্রান্ত বাস্তবায়ন করেছে।

ভিনদেশী দখলদাররা মুসলিম দেশগুলোতে তাদের কর্তৃত্ব লাভ করার পর জীবনব্যবস্থা থেকে ধর্মকে পৃথক করতে শুরু করতে থাকে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচলন করতে থাকে। তারা জীবনব্যবস্থা ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে দ্বীনের যেকোনো ভূমিকাকে বাতিল করে দিয়েছে যেমনিভাবে তারা জীবনব্যবস্থা ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে উলামাদের ভূমিকা কমিয়ে দিয়েছে। এ অবস্থার ফলে আলিমগন তাদের মাদ্রাসাগুলোতে কিছু ব্যক্তিগত ইবাদত ও ব্যক্তিগত ইবাদতের পাঠদান নিয়ে সান্ত্বনা লাভ করেছে, যে মাদ্রাসাগুলো দাওয়াত ও পথ প্রদর্শনের আলোকদিশারী এবং উম্মাহর প্রতিরক্ষার পাথেয় হয় এমন নেতৃত্ব বের করার পরে আজ সেগুলোতে বৈরাগ্যবাদ প্রাধান্য পেয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদীরা এ পর্যন্ত-ই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তারা রাষ্ট্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিমদের সন্তানদের মধ্য থেকে এক নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করেছে, যেসব প্রতিষ্ঠান তারা তৈরি করেছে তাতে ভিনদেশী শিক্ষকদের মাধ্যমে অথবা সাম্রাজ্যবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচ্যবাদী ও খৃষ্টানদের কোলে প্রতিপালিত আমাদের জাতির সন্তানদের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করার জন্য।

এই নতুন প্রজন্ম দ্বীনের সাথে শত্রুতা করতে শুরু করল এবং তারা দ্বীনের মৌলিক বিষয় ও বিধিবিধানকে অবজ্ঞা করতে লাগল। তারা ভিনদেশী দখলদারদেরকে একনিষ্ঠ বন্ধু বানাল, যেই দখলদাররা সামরিকভাবে এসব দেশ থেকে চলে যাওয়ার সময় দেশগুলোর শাসনক্ষমতার লাগাম তাদের কাছে অর্পণ করে যায়।

আর এই ইউরোপিয়ান (পশ্চিমা) প্রজন্মের আরেকটি বিষয় হল, তারা নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্বে এমন এক পন্থা উদ্ভাবন করেছে যে, তা বাহ্যিকভাবে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত, আর অভ্যন্তরীণভাবে ইসলাম থেকে বিচ্যুতি এবং ইসলামের নিদর্শন ও বিধি-বিধানের সাথে শত্রুতা রাখে। যাতে তারা এই অঙ্গনকে পুরোপুরি ইউরোপিয়ান (পশ্চিমা) প্রজন্মের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে পারে। অতঃপর তারা আলিম ও দ্বীনের প্রতি অধিক আন্তরিক ব্যক্তিদেরকে নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার কেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে দিতে থাকে,যাতে তারা কোনো ধরণের বাঁধার মুখোমুখি হওয়া ছাড়াই পশ্চিমা ধাঁচে মুসলিম জাতির প্রায় সকল ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করতে সক্ষম হয়।

আর ভিনদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের চলে যাওয়ার পূর্বে এই নতুন প্রজন্মের জন্য নতুন দ্বীন তৈরি করেছিল, যেটিকে তারা আল্লাহর দ্বীনের স্থানে প্রতিস্থাপন করেছিল। সেটি হচ্ছে এমন দ্বীন [গণতন্ত্র], যা মানুষের খেয়াল-খুশির মাধ্যমে মানুষকে শাসন করে। যে দ্বীনে রাজনীতি ও শাসন কর্তৃত্ব অধিকারের ক্ষেত্রে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ও সর্বনিকৃষ্ট মানুষ সমান।

অতঃপর ধর্মনিরপেক্ষবাদী শাসকেরা যথাসাধ্য সামরিক শক্তি, শাস্তি ও বন্দি রাখার কৌশলের মাধ্যমে তাদের নতুন দ্বীনের আইন-কানুন মজবুত করতে শুরু করল, যাতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর শাসন ও জীবনব্যবস্থায় এই নতুন পদ্ধতি স্থায়ী হয়ে যায়। সে জন্য তারা মুসলিম দেশগুলোতে এমন পদ্ধতিতে শিক্ষানীতি রচনা করেছে, যা মুসলিম দেশে পাশ্চাত্যের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মানানসই হবে।

আর সরকার তত্ত্বাবধান করছে এমন ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে শিক্ষাপ্রদান পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলো আরেক বন্ধ্যাত্বের শিকার। শরিয়তের শিক্ষাকে রুহ

বিবর্জিত অবস্থায় এমন কৃত্রিম শব্দে শিক্ষা দেওয়া হয়, যেগুলোতে সাহিত্যকর্ম ও গ্রিক দর্শন প্রভাব বিস্তার করে থাকে, বাস্তব ক্ষেত্রে যার কোনো প্রয়োগ পাবেন না।

এভাবেই দ্বীন সালাত, যাকাত ও ব্যক্তিগত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু ইবাদতে এবং সামান্য কিছু আকিদার আলোচনায় সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, যেই আকিদার আলোচনাসমূহ কালামিয়্যাহ ও আকিদাগত বিভিন্ন ফিরকার সাথে সম্পৃক্ত, যা শতশত বছর পূর্বে বিদ্যমান ছিল। আর সমসাময়িক ফিরকা এবং আকিদাগত দল ও তাদের প্রচন্ড ফিতনা যা ইসলামি বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত প্লাবিত করেছে, এই দেশগুলোতে আমাদের ইসলামি শিক্ষানীতি সেগুলোর ধারে কাছেও যায়নি এবং এগুলোর ভ্রষ্টতা সাধারণ মানুষের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ণনা করেনি, যাতে তারা সেগুলো থেকে সতর্ক থাকতে পারে।

অতঃপর লাল কমিউনিস্টরা এসে মানুষের আকল ও অনুভূতি নিয়ে খেলা করেছে। এরপর এসেছে পাপাচারী লিবারেল (উদারপন্থী) মতবাদ, যারা আল্লাহর শাসনকর্তৃত্ব ও মানুষের মাঝে আল্লাহর শরিয়ত বাস্তবায়নের ব্যাপারে আল্লাহর মোকাবিলায় লিপ্ত হয়েছে।

অতঃপর এধরণের দূর্যোগময় পরিস্থিতিতে তালিবান আন্দোলন আত্নপ্রকাশ করেছে এবং রাজনীতি ও কর্তৃত্বের লড়াইয়ের ময়দানের প্রশস্ত দরজা দিয়ে প্রবেশ করে ভারসাম্যতা ফিরিয়ে এনেছে। তারা সমাজব্যবস্থা পরিবর্তন করেছে এবং সকল বিষয়কে নতুনভাবে যথাস্থানে ফিরিয়ে এনেছে। যার ফলে মসজিদের ইমাম পুনরায় বিশ্ববাসীর কাছে মুখ ভরে সুউচ্চ আওয়াজে এই ঘোষণা করতে বের হয়েছে যে, "(শাসন কর্তৃত্ব চলবে একমাত্র আল্লাহর)" এবং পুনরায় কমিউনিস্ট (সাম্যবাদী) ও লিবারেলদের (উদারপন্থী) কর্ণকুহরকে এই বাণীতে ঝংকৃত করেছে যে, "{আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দ্বারা শাসন/ফায়সালা করে না তারা কাফির }"-সূরাহ আল-মায়িদাহ-৪৪

এভাবে প্রায় একহাজার বছর অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় মসজিদের ইমাম এদেশে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব লাভ করেছেন এবং নতুনভাবে প্রমাণ করেছেন যে,মসজিদের ইমাম-ই

অন্য যেকারো চেয়ে সর্বোচ্চ ইমামতি (রাষ্ট্র পরিচালনা)-র অধিক যোগ্য। এটি-ই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাহ। আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করার যে আপদ মুসলিম উম্মাহর উপর আপতিত হয়েছে, তা এই দ্বীনের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নয়।

তালিবান সংগঠন ইসলামি হুকুমত কায়েম করা ও শরিয়ত বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে পশ্চিমাদের সবচেয়ে বড় মিথ্যা অপবাদকে খণ্ডন করেছেন, যে মিথ্যাকে পশ্চিমারা মুসলিমদের হৃদয়ে দৃঢ় করে দেওয়ার জন্য প্রায় দুইশ বছর ধরে চেষ্টা করেছে। আর তা হলঃ বর্তমান যুগে রাষ্ট্র ও নেতৃত্বের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য ইসলামি শরিয়ত উপযোগী নয়। তালিবানরা তাদের এই কাজের মাধ্যমে বাস্তবরূপে প্রমাণ করেছেন যে, রাষ্ট্র ও সরকারের কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে পশ্চিমা চিন্তার নিকৃষ্ট ব্যক্তি ও অন্যান্যদের থেকে দ্বীনের শিক্ষার্থী ও মসজিদের ইমামগণ অধিক যোগ্য।

তালিবানদের এই অভিজ্ঞতাকে সফল করার পথটি ফুল বিছানো ছিল না, যে অভিজ্ঞতা সফল হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ নিরাশ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল; বরং তা ছিল রক্ত, দেহ, কুরবানী ও দীর্ঘ ধৈর্যের পথ। এতে তারা দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন এবং তারা উত্তম যুবকদের মধ্য থেকে আল্লাহ তা'আলার কিতাবের হাজার হাজার হাফিজ ও তালিবে ইলমকে উৎসর্গ করেছেন। তাদের রাত্রগুলো দিনের সাথে মিলে একাকার হয়ে গেছে, যে পর্যন্ত না তারা সকল প্রকার বাঁধা-বিপত্তির উপর বিজয়ী হয়ে গেছে এবং ঈমানের দৃঢ়তা ও দ্বীনি মজবুতির মাধ্যমে নতুন পদ্ধতি উদ্ধাবন করেছে। মানুষের এই বলে ভীতি প্রদর্শন তাদেরকে নিরস্ত করতে পারেনি। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

"মানুষেরা তোমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে ভয় কর। (মানুষেরা এই কথা বলার পরে) অতঃপর তাদের ঈমান আরো বেড়ে যায় এবং তারা বলে আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই সর্বোত্তম কর্ম সম্পাদনকারী "

আলে ইমরান-১৭৩

তারা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বলপ্রয়োগের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি, যেই বলপ্রয়োগ তাদের এই আন্দোলনের উন্নয়নের সকল স্তরের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে। বিপদ যত কঠিন হোক না কেনো, তারা যেসব মূলনীতিতে বিশ্বাস করে, সে ব্যাপারে তারা কোনো আপোষ করেনি। তারা ইসলামি শরিয়তকে ত্বগুতদের শরিয়ত ও আল্লাহর কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিরুদ্ধে শত্রুতাকারী মানব ইবলিসদের শাসনের সাথে মিলায়নি।

যখন কুফুরি বিশ্ব তালিবানকে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি ও রাজনৈতিক আপোষের মাধ্যমে নত করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে এবং যখন এই আন্দোলনের ধারাকে গণতান্ত্রিক ধাঁচে রুপান্তরে তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। যেখানে বহু আন্দোলন ও ইসলামি দল এসিডের (শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান) দ্বারা গলে যাওয়ার পর তাদের আকৃতি বদলে ফেলেছে এবং নিজেদেরকে ত্বগুত সরকারগুলোর জন্য প্রদর্শনী বানিয়ে ফেলেছে, তখন কুফুরি বিশ্ব তালিবানদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ক্রুসেড যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে। পশ্চিমা শয়তানরা তাদের শয়তানি চক্রান্তের মধ্য দিয়ে যেভাবে মুসলিমদেরকে অচেতন করেছে, মুসলিমরা সেই অচেতনতার গভীর নিদ্রা থেকে সজাগ হয়ে তালিবানদের দিকে মনোযোগী হওয়ার পূর্বেই তারা (কাফিররা) তালিবানদের এই অভিজ্ঞতাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার জন্য সকল শক্তি ব্যয় করেছে।

কিন্ত আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র কুফুরি বিশ্বকে এসকল দরিদ্রদের দ্বারা পরাজিত করতে চেয়েছেন। কুফুরি বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যারা তাদের রক্ত, দেহ এবং অল্প কিছু হালকা অস্ত্র ব্যতীত অন্যকিছুর মালিক নয়। এসব অস্ত্রের জন্য শুধু জং-ধরা কিছু গুলি আছে, যেগুলো তারা আট বছরের অধিক পূর্বে তাদের সরকারের পতন হওয়ার সময় মাটিতে পুঁতে রেখেছিল।

এই হল সেই উদভ্রান্ত আমেরিকা, যে তাদেরকে (তালিবানদেরকে) তোষামোদ করে এবং তারা তাদের দালালদের জন্য কাবুলে যে সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে, তাতে তালিবানদের

অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা করে। আর বিগত আট বছরে তালিবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর পরই আমেরিকা এই লাঞ্ছনার স্তরে নেমে এসেছে।

অন্যদিকে তালিবান সংগঠন নিজেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মোকাবেলায় এমন আন্দোলন হিসেবে পরিচালনা করেছে, যা মানুষ পশ্চিমাদের লালিত-পালিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নেতৃত্বে দেখে আসছে তাদের বিপরীতে যার নেতৃত্ব দেয় মসজিদ ও মিহরাব থেকে বের হওয়া ব্যক্তিরা।

এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ তাদের আপোষহীন-প্রজ্ঞাপূর্ণ অবস্থান গ্রহণের মধ্য দিয়ে এটি স্পষ্ট করেছে, এই আন্দোলন দরবেশদের দল নয় যে, তাদের অনুভূতি নিয়ে বিশ্ব-রাজনৈতিক শয়তানরা তাদের শয়তানি কৌশল ও চক্রান্তের মাধ্যমে খেলা করবে।

বরং এটি এমন একটি আন্দোলন যার নেতৃত্ব দেয় ইসলামের এমন আলিমগণ, যাদেরকে শাসনকর্তৃত্ব, যুদ্ধবিদ্যা এবং বিশ্ব-সংঘাতের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করেছে। আর তারা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও কূটনীতির সুক্ষ্ম বুঝ ধারণ করেন।

তালিবানদের এই মৌলিক চিন্তা ধারাটি রাজা-বাদশাহ ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের থেকে নেতৃত্ব অপসারণ করে উলামায়ে কেরামের কাছে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব হস্তান্তর করা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয় বরং বিষয়টি এর চেয়ে বড় বিষয়ের দিকে অতিক্রম করে। আর তা হল যুবক মুজাহিদদের এমন এক নতুন প্রজন্ম তৈরী করা, যারা সুক্ষ্মবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার সাথে যুদ্ধ, রাজনীতি, মিডিয়া এবং বৈশ্বিক ষড়যন্ত্রের মোকাবিলার পাশাপাশি এটিও বুঝবে যে, লড়াইয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে ধারাবাহিক খাপ খাইয়ে নেওয়ার মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্র তাদের কাছে কি চাচ্ছে।

এটি সংগঠনের জন্য চলমান ক্রুসেড যুদ্ধে মুসলিম জাতিকে নেতৃত্বের উপকরণ সরবরাহ করে, যে যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয় পশ্চিমারা এবং মুসলিম বিশ্বে তাদের দালাল-পাপাচারী শাসকেরা, যারা তাদের সিংহাসনের ভয়ে পশ্চিমাদের সকল চাওয়া-পাওয়া পূরণে সাড়া দেয়।

যখন আমরা তালিবানদের মৌলিক স্তম্ভসমূহের মধ্যে এই স্তম্ভের ব্যাপারে সংক্ষেপে বলতে চাই, তখন বলবঃ বর্তমান যুগে মুসলিমদেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য উলামায়ে কেরাম ও মুজাহিদগন যোগ্য হওয়ার নির্ভরযোগ্যতা তালিবান আন্দোলন মুসলিমদেরকে অর্জন করিয়েছে।

ইসলামের আলিমদের উপর যে স্থবিরতা ও নিষ্ক্রিয়তা চেপে বসেছে, তালিবান আন্দোলন তা দূর করেছে এবং তাদেরকে নতুনভাবে নেতৃত্ব ও শাসনের অঙ্গনে সমর্পণ করেছে।

তালিবানরা তাদের পূর্বসূরি ইসলামি সংগঠনগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে ফায়দা গ্রহণ করেছেন এবং সেগুলোর সাথে নতুন বিষয় সংযোজন করেছেন, যেন বর্তমান ও ভবিষ্যতের নেতৃত্ব ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন ও যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। তবে এই অভিজ্ঞতা অধিক সুপথ প্রদর্শন এবং ব্যাপক ঐতিহাসিক ইলমি প্রত্যায়নের মুখাপেক্ষী, যা এই আন্দোলনের সকল দিক অন্তর্ভুক্ত করে।

এই আন্দোলন শরিয়তের গণ্ডির মধ্যে সামরিক ও বেসামরিক কাজের মধ্য দিয়ে ইসলামের জন্য কাজ করার এক নতুন দৃষ্টান্ত পেশ করেছে, যা পূর্বসূরিদের জামানায় ইসলাম যে ভিত্তির উপর ছিল তা ফিরিয়ে আনা এবং ইসলাম ও তাঁর শত্রু কুফফার জাতির মধ্যে বর্তমান যুগের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের ময়দানে নিত্য-নতুন পরিস্থিতির মধ্যে সমন্বয় করে চলে। যদিও প্রোপাগান্ডাকারী ও মুনাফিকরা বিষয়টিকে তুচ্ছ করার চেষ্টা করে থাকে।

আর এটি হল শাসনকর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে অনুসন্ধান করার স্বাধীনতা। শাসন-কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে অনুসন্ধান করা, জিহাদ ও শাসন-কর্তৃত্বের জন্য এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাবলী ও সমসাময়িক মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ে তার প্রভাবের প্রতি ইসলামি চিন্তাবিদদের মনোযোগ, এসব ক্ষেত্রে বর্তমান জামানার কাফিরদের মনোযোগের চেয়ে কম হওয়া উচিত নয়।

৭. ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্রকে সর্বাত্মকভাবে প্রত্যাখ্যান করা এবং এটিকে আধুনিক জাহেলিয়াতের দ্বীন হিসাবে গন্য করা:

তালিবানদের মৌলিক চিন্তাধারার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হল; গণতন্ত্রকে সর্বাত্মকভাবে প্রত্যাখ্যান করা এবং এটিকে আধুনিক পশ্চিমা জাহেলিয়াতের দ্বীন হিসাবে গন্য করা, যা (গণতন্ত্র) আল্লাহর সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি অহির মাধ্যমে নাযিলকৃত সঠিক পথ প্রদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং জীবনের সকল অঙ্গনে মানুষের মনের চাহিদার আলোকে শাসনকার্য পরিচালনা করে।

আর তালিবান আন্দোলন অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, রাজনীতি, বিধান প্রণয়ন, অর্থনীতি, নৈতিকতা ও সমাজ ব্যবস্থার ব্যাপারে ইসলাম হল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, কখনো তা গণতন্ত্র বা অন্যকোনো দ্বীন ও বিধান দ্বারা সত্ত্বায়নের মুখাপেক্ষী নয়।

আর এটিই আল্লাহর সুদৃঢ় কিতাবের বাণীর দ্বারা উদ্দেশ্য। আল্লাহর তা'আলা বলেন-

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। অতএব যে ব্যাক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু গোনাহর প্রতি কোনো প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। —মায়িদাহ-৩"

আল্লাহ্ সুব হানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন-

"আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"

[সূরা বাকারাহ-৮৫]"

সুতরাং ইসলাম হল এমন এক দ্বীন, যা মানব জীবনের সকল অঙ্গনকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের সকল সমস্যার সমাধান দেয়। যদি এমনটি না হত, তাহলে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য এই দ্বীনকে সন্তুষ্টির সাথে মনোনীত করতেন না এবং এই দ্বীনের বাহিরে অবস্থান করা ব্যক্তিদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত হিসাবে গন্য করতেন না।

তালিবান বিশ্বাস করে, গণতন্ত্র হচ্ছে আধুনিক জাহেলি দ্বীন, যা পৃথিবীতে আল্লাহর হাকিমিয়্যাহ বা আল্লাহর শাসনকে অস্বীকার করে এবং পৃথিবীতে মানুষের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব নির্বাচন করে। অতঃপর সংখ্যাগরিষ্ঠ পক্ষ বিধান প্রণয়ন করে এবং হালাল ও হারাম করার মানদণ্ড নির্ধারণ করে। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ-ই তাদের প্রবৃত্তির চাহিদার আলোকে ও তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য শাসক নির্বাচন করে এবং মানব জীবনের যেকোনো বিষয়ে আল্লাহর চূড়ান্ত হক শরিয়তের কাছে আত্নসমর্পণ করে না। সুতরাং গণতন্ত্রে সংখ্যাগুরু ইলাহ (আল্লাহর) এর স্থান দখল করেছে, আর সংখ্যাগুরুর মনের চাহিদা ইলাহ (আল্লাহর) এর শরিয়তের স্থান দখল করেছে।

আর গণতন্ত্রের ব্যাপারে তালিবানদের চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে, গণতন্ত্র হচ্ছে একটি দ্বীন, যা চার্চের বিকৃতি ও সকল মানবাধিকারের বিরুদ্ধে চার্চের সীমালঙ্ঘনের পর আধুনিক পশ্চিমা দার্শনিকরা প্রণয়ন করেছে। গণতন্ত্রে বিধান রচনার মূল উৎস হল: মানুষের প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি। আর গণতন্ত্র দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সে দুটি হলঃ

এক- সার্বভৌমত্বের উৎস: এর ব্যাখ্যা হল, হালাল ও হারাম করার ব্যাপারে সর্বোচ্চ সার্বভৌমত্ব হল মানুষের। এটি তার চেয়ে উচ্চস্তরের কিংবা সমমানের মর্যাদাসম্পন্ন অন্য কারো সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেয় না। সার্বভৌমত্ব হচ্ছে, বস্তু, ব্যক্তি ও পরিবেশের উপর শাসনের জন্য পরম কর্তৃত্ব, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিতের মতের ভিত্তিতে পরিচালিত।

দুই- আর দ্বিতীয় উৎস হল: অধিকার এবং স্বাধীনতার উৎস, যার মূল কথা হল, যতক্ষণ না অন্যদের স্বাধীনতা বাঁধাগ্রস্ত করে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন ব্যক্তি যা ইচ্ছা তা করার ক্ষমতা রাখে। গণতন্ত্র মানুষকে যে ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছে, কোনো ধর্ম ও শরিয়তের জন্য ঐ

স্বাধীনতা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা (গণতান্ত্রিক দ্বীনে) বৈধ নয়। এক্ষেত্রে ধর্ম ও আইনের অবস্থান যাই হোক না কেন। সুতরাং গণতন্ত্রে মু'মিন ও কাফির বলে (আলাদা) কিছু নেই। যেমনিভাবে সেখানে কুফর ও ঈমান বলে (আলাদা) কিছু নেই। সেখানে সকল অধিকারের ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে পূর্ণ সমতা রয়েছে। সেখানে ভাল ও মন্দ হচ্ছে, সংখ্যাগুরু যেটিকে ভালো মনে করে সেটিই ভালো, আর সংখ্যাগুরু যেটিকে মন্দ মনে করে সেটিই মন্দ, এগুলোর সাথে দ্বীন (ইসলাম) একমত হোক কিংবা একমত না হোক।

গণতন্ত্র শুধুমাত্র এসকল দৃষ্টিভঙ্গির উপর সীমাবদ্ধ নয় বরং তা অন্যান্য মতবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে জানা যায়, সেগুলোর মধ্য থেকে একটি হল বহুদলীয় রাজনীতি, দখলদাররা ইসলামি বিশ্বে যার বীজ বপনে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এবং একই দেশের মুসলিমদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করার লক্ষ্যে এটিকে সমর্থন দিচ্ছে।

তালিবান আন্দোলন মনে করে, মুসলিম দেশে বহুদলীয় রাজনীতির চিন্তাধারা মুসলিমদেরকে বিভক্ত করার জন্য এবং তাদেরকে বিভিন্ন দলে-উপদলে ভাগ করে একে অপরের সাথে চক্রান্ত করে ক্ষমতার নেতৃত্বে যাওয়ার মাধ্যম।

এজন্য তালিবান একটি ন্যায্য ইসলামি ব্যবস্থায় বিশ্বাসী, যা সকল মুসলিমদেরকে তাওহিদের কালিমার ভিত্তিতে ইসলামের এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করে, যাতে করে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নিকৃষ্ট প্রতিযোগিতা বন্ধ করা যায়। যেমনটি তারা (তালিবান আন্দোলন) বর্তমান সময়ে মুসলিমদের উলুল আমর বা নেতৃত্বের জন্য নসিহতের পথ উন্মুক্ত হওয়াকে জরুরি মনে করে। {কেননা দ্বীন হল কল্যাণ কামনা করা} এবং {সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা} আর সর্ব শ্রেষ্ঠ কল্যাণ কামনা হল মুসলিমদের ইমামের জন্য (সম্পদ/সময়) ব্যয় করা।

আর বস্তুবাদী, ধর্মনিরপেক্ষবাদী, জাতীয়তাবাদী ও অন্যান্য দল যাদেরকে দখলদার বাহিনী তৈরী করে অথবা যাদেরকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো ক্ষমতা দখল করার জন্য তৈরী করে তারা তাদেরকে অর্থায়ন করে থাকে। তারা মিলিয়ন মিলিয়ন অর্থ খরচ করে চুক্তি/সনদ ক্রয় করার

পিছনে, যেন সেই চুক্তিকে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে তাদের উদ্দেশ্য সফল করার বাহন বানাতে পারে। ইসলাম ও ইসলামি শরিয়তের মানদণ্ডে তাদের এসব কাজ সম্পূর্ণ মূল্যহীন। মুসলিম ভূমিতে এসকল দল তৈরিতে সমর্থন দেওয়া ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার অনুমোদন দেওয়ার কোনো বৈধতা নেই।

বিগত দিনে আফগানিস্তান ও ইসলামি বিশ্বের মুসলিমগন কমিউনিস্ট পার্টি থেকে যে সকল হত্যাযজ্ঞ, শাস্তি, বিতাড়ন, দ্বীন ও পবিত্র বিষয়গুলো নিয়ে বিদ্রুপ করা ও উম্মাহকে তার দ্বীন থেকে বের করে ফেলার যে ব্যথা ভোগ করেছেন তা মুসলিমগন ভুলে যাননি। ঐ ক্ষত মুছে যাওয়ার পূর্বেই পশ্চিমা বোমাবর্ষণকারীদের ছায়ার আওতায় লিবারেল বা উদারপন্থী গণতন্ত্র এসেছে মুসলিমদেরকে সবচেয়ে কঠিন লাঞ্ছনা ও শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করানোর জন্য। আর আফগানিস্তান, ইরাক, সোমালিয়া, ফিলিস্তিন ও অন্যান্য ইসলামি দেশের ঘটনাবলী মুসলিম বিশ্বে কাফির রাষ্ট্রগুলোর অনুগ্রহে তৈরি এসব দলের অপরাধ ছাড়া আর কিছু নয়।

তালিবানরা মনে করে, আফগান মু'মিন জাতির গত ত্রিশ বৎসর যাবত চলমান জিহাদ গণতন্ত্রের পথে ছিল না এবং পশ্চিমাদের চিন্তাধারার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করার জন্য ছিল না বরং সর্বদা তা ছিল ইসলামি জিহাদ। এই মুসলিম জাতি আল্লাহর কালিমাকে তার বান্দাদের মাঝে বিজয়ী করা ও আল্লাহর শরিয়ত বাস্তবায়ন করার জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন শহিদদেরকে পেশ করেছে।

এমন প্রত্যেক চিন্তাধারা ও মতবাদ আমাদের ঈমানদার জাতিকে এই মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দেয় এবং এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও জিহাদ-শহিদদের ভূমিতে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাঝে এমন স্বাধীনতা দাঁড় করায় , যেন এটি গ্রহণীয় না হয়। সেজন্য আবশ্যক হচ্ছে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন ও আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য এসব (মতবাদ ও চিন্তাধারা) নির্মূল করা।

সুতরাং তালিবানদের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র হল আধুনিক জাহেলিয়াতের একটি দ্বীন, যা আগুন ও লোহা অর্থাৎ শক্তি ও ধ্বংসের জোরে বিশ্বে বিস্তার ঘটানোর চেষ্টা করছে। আর তাদের দৃষ্টিতে ইসলাম হল আরেকটি দ্বীন। আর সেটি একমাত্র সত্য দ্বীন, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা

সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ করেছেন। শুধু এই একটি দ্বীনেই মানুষের সফলতা রয়েছে। গণতন্ত্র ও ইসলামের মাঝে পার্থক্য হল কুফর ও ঈমানের পার্থক্য।

৮। জাহেলি দলপ্রীতি প্রত্যাখ্যান করে এক কাতারবদ্ধ করাঃ-

জাহেলি দলপ্রীতি প্রত্যাখ্যান করে এক কাতারে ঐক্যবদ্ধতা বজায় রাখা তালিবান আন্দোলনের চিন্তাধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এ কারণেই কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা এবং সংগঠনের লোকদেরকে চরমপন্থি, মধ্যমপন্থী ও এ ধরনের বিভিন্ন নামে বিভক্ত করার ব্যাপারে শত্রুদের অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও সংগঠনে কোনো ফাটল ও বিভক্তি পাওয়া যায় না। বরং তা সর্বদা মজবুতি ও দৃঢ়তার সাথে এমন নেতৃত্বের অধীনে তাদের ঐক্যবদ্ধতা বজায় রেখে আসছে, যার কমান্ডার সুদৃঢ় ঈমানি অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে সমস্ত কুফফার বিশ্বের সাথে এই আন্দোলনের মহাযুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন।

এক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক রয়েছে, যা সংগঠনের ঐক্যবদ্ধতা বজার রাখতে সহায়তা করেছে ও সংগঠনে বিভক্তি ও শাখা-প্রশাখা হওয়া থেকে হিফাজত করেছে, সেগুলো নিম্নে:

এক-সংগঠনের প্রত্যেক সদস্য থেকে সৎ কাজে স্বেচ্ছায় আমিরের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য পাওয়া। কেননা ইসলামে উলুল-আমরের আনুগত্য একটি শরিয়তসিদ্ধ বিষয়। শরিয়তের দলিল প্রমাণ এর প্রতি উৎসাহ দিয়েছে এবং মুসলিম জামা'আতগুলোকে শরিয়তের ঐ সকল দলিল প্রমাণ অমান্য করার পরিণাম সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছে। তালিবান আন্দোলনের অধিকাংশ ব্যক্তি ও নেতৃবৃন্দ দ্বীন ইসলামের আলিম ও শরিয়তের ইলমের শিক্ষার্থী হওয়ায় তারাই শরিয়তের ঐ সকল দলিল প্রমাণ বুঝা এবং সেসবের দ্বীনি শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে সর্বাধিক যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি। এই দ্বীনি উপলব্ধিকে আঁকড়ে ধরার ফলে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তির অনুসরণ, খ্যাতিলাভ ও দুনিয়ার সামগ্রীর পিছনে

দৌড়ানো থেকে বিরত থাকেন, যেখানে অনেক সময়ই ইসলামি আন্দোলনগুলো থেকে দলছুট ব্যক্তিরা দুনিয়ার উক্ত সামগ্রীতে নিপতিত হয়েছে।

দুই-শত্রুদের প্রোপাগান্ডার অনুসরণ না করা এবং সংগঠনের নেতৃত্ব ও বিভিন্ন ঘটনাবলীর ব্যাপারে তালিবানদের অবস্থান নিয়ে শত্রুরা যা বলে বেড়ায় সেদিকে মনোযোগ না দেওয়া। কেননা ইসলামি আন্দোলনগুলোর সারিতে অধিকাংশ বিভেদ শুরু হয় নেতৃত্বের ব্যাপারে আন্দোলনগুলোর অনুসারীদের মাঝে শত্রুদের প্রচারিত প্রোপাগান্ডা ও সংশয় সৃষ্টির কারণে। (তালিবান) আন্দোলনের অধিকাংশ সদস্যই শরয়ী' ইলমের অধিকারী হওয়ার ফলে আল্লাহর এই বানীর উপর আমল করার মাধ্যমে তাদের শরই' ইলম শত্রুদের প্রচারণায় প্রভাবিত হওয়া থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেছেন-

"যখন নিরাপত্তা বা ভয়ের কোনো সংবাদ তদের কাছে আসে তখন তারা তা প্রচার করে থাকে, যদি তারা তা রাসূল এবং তাদের মধ্যে যারা ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানী তাদের কাছে পেশ করত তাহলে তাদের মধ্যে তথ্য অনুসন্ধানকারীগন সেটার যথার্থতা যাচাই করতে পারত, যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকত তাহলে তোমাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া সকলে শয়তানের অনুসরণ করত।}" (সূরাহ নিসা-৮৩)

ফলে তারা বিষয়টি শত্রুদের প্রচার করা ফরম্যাটে গ্রহণ না করে তাদের উলুল আমরদের (দ্বীনি দায়িত্বশীল) কাছে অর্পণ করেন।

অন্য দিকে ইসলামে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় (উলুল আমরের) আনুগত্য আবশ্যক। সুতরাং এই আবশ্যকতা ও আন্দোলনের বাস্তব অবস্থার ব্যাপারে উপলব্ধি সংগঠনে ফাটল সৃষ্টি প্রতিরোধের প্রভাবক সমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে।

তিন- নিশ্চয়ই (তালিবান) আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ দুনিয়ার সামগ্রীর ব্যাপারে কোনো দিক থেকে অন্যান্য সদস্য থেকে ভিন্ন হয় না। সুতরাং আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এমন কোনো বিষয় নেই যা তাদের থেকে অনুসারীদেরকে দূরে সরিয়ে দিবে। কেননা তারা সকলেই দরিদ্র ও

সাধারণ জনতার অন্তর্ভুক্ত। তারা সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপন করেন, তাদের ভরণ-পোষণ সংগঠনের সাধারণ সদস্যদের ভরণ-পোষণের মতই বরং কখনো কখনো নেতৃবৃন্দের জীবন যাপনের অবস্থা তাদের অনুসারীদের অবস্থা থেকে দুর্বল ও কঠিন হয়। আজ পর্যন্ত পশ্চিমারা (তালিবান) নেতৃবৃন্দের এমন কোনো অর্থ-সম্পদ পায়নি, যার মাধ্যমে পশ্চিমারা তাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা করবে বা এটিকে তাদের বিরুদ্ধে চাপ প্রয়োগের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করবে। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের এই দারিদ্র, কঠিন জীবন ও দুনিয়ার সামগ্রীর প্রতি অনাগ্রহের বিষয়টি সংগঠনের সদস্য ও পুরো জাতিকে সন্তুষ্ট করেছে। ফলে এসকল গুণাবলী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের চারপাশে জড়ো হতে ও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করার ব্যাপারে মানুষের অন্তরে মুহাব্বত সৃষ্টি করেছে।

চার-বিভিন্ন আন্দোলন ও দলের সারিতে বিভেদ অধিকাংশ সময় পদ ও দায়িত্বের ব্যাপারে প্রতিযোগিতার কারণে সৃষ্টি হয় কিন্তু তালিবান আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা পদের বিবেচনায় তাতে অনেক কষ্ট রয়েছে, কোনো আভিজাত্য নেই। এটি কোনো উপহার নয় বরং তা হচ্ছে কষ্ট এবং জিহাদ ও কিতালের ময়দানে বের হওয়া এবং নিজেকে হত্যা, জখম, বন্দি ও বিপদে নিক্ষেপ করা। তাদের এই অবস্থা শুধু বর্তমানে নয় বরং এটি একটি কর্মপদ্ধতি যা তালিবানদের শাসন আমলেও প্রচলিত ছিল। এমনকি আপনি হয়তো আজকে সংগঠনের একজন সদস্যকে মন্ত্রী হিসাবে পাবেন, অতঃপর পরের দিন-ই আপনি তাকে গোলা বর্ষনের সামনের সারির কমান্ডার হিসাবে পাবেন, অতঃপর তার পরের দিন আপনি তাকে অন্যকোনো সাধারণ কাজে পাবেন, এর পর হয়তো তাকে অফিসিয়াল কোনো দায়িত্বেই পাবেন না। আবার কোনো সময় তাকে পাবেন সে কোনো প্রদেশের গভর্নর। সুতরাং পদ ও দায়িত্ব অনেক কষ্টের এবং এতে কোনো দুনিয়াবি প্রাপ্তি নেই, যা অর্জনের জন্য মানুষ প্রতিযোগিতা করবে। আর একারণে তালিবান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের অন্তরে এই বিষয়ে প্রতিযোগিতার কোনো মনোভাব নেই বরং তারা পদকে বড় দায়িত্ব হিসাবে

গন্য করে, যা বহন করা তাদের কাছে কষ্টকর। সে সকল পদের ব্যাপারে শুধুমাত্র ঐ সকল মানুষই অগ্রসর হতে পারে যাদের দুনিয়ার প্রতি কোনো আগ্রহ নেই।

তালিবানদের শত্রুরা এই আন্দোলনের লোকদেরকে চরম্পন্থী ও মধ্যমপন্থী ভাগে বিভক্ত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিন্ত তাদের চেষ্টা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। যেহেতু তারা সংগঠনের কাতারে এমন কাউকে পায়নি যে তাদের প্রচারণার পিছনে চলবে। ফলে এই পদ্ধতিতে বড় বড় প্রস্তাব এবং আর্থিক ও রাজনৈতিক ঘুষ শত্রুদের কোনো কাজে আসেনি। কেননা এই আন্দোলনে যোগদান করা হয় ঈমানের দৃঢ়তা ও আল্লাহর রাস্তায় কুরবানির জন্য, কোনো পদ লাভের জন্য নয়।

আর এর অর্থ এই নয় যে, এই আন্দোলনের কাতার সুবিধাবাদী, পরাজিত মানসিকতাসম্পন্ন ও স্বার্থপর থেকে সম্পূর্ণ পুতঃপবিত্র। বরং এই আন্দোলন অন্যান্য ইসলামি সংগঠনের ন্যায় মানুষ দ্বারা গঠিত। আর মানুষ ফেরেশতা নয়। তবে তালিবানরা অন্যান্য সংগঠন থেকে ভিন্ন যেই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তা হল: এই আন্দোলনের জবাবদিহিতামূলক স্বভাব ও কন্টকাকীর্ণ পথে চলার কারণে পরাজিত মানসিকতাসম্পন্ন ও সুবিধাবাদীরা সংগঠনের কাতারে স্থির থাকতে পারবে না। কেননা রোগাক্রান্ত আত্মা বিপদআপদ, কষ্ট ও ক্লেশময় জীবনে ধৈর্যধারণ করতে পারে না।

আন্দোলনের দৃঢ়তাকে মজবুতকারী বিষয় সমূহের একটি হলঃ জাতিগত,ভাষাগত,আঞ্চলিক ও অন্যান্য স্বজনপ্রীতি সহ সকল প্রকার গর্হিত জাহেলি স্বজনপ্রীতি থেকে এই আন্দোলন দূরে থাকে। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে উজবেক, তুর্কমান, তাজিক, বালুচ, পশতুন, নুরিস্তানি এবং বিভিন্ন জাতির সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য ব্যক্তিরা রয়েছেন। এটি এমন একটি বাস্তবতা যা আফগানের সকল প্রদেশের বিস্তৃত এলাকায় বিদ্যমান। আর এই আন্দোলনে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হল ইখলাসের সাথে তাকওয়া এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করা। আর এই নীতি সংরক্ষণ করার জন্য (তালিবান) আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্ব ও দৃঢ়তার সাথে চেষ্টা করে থাকে।

তালিবানের নিকট এটিও মৌলিক চিন্তার অন্তর্ভুক্ত যে,ইসলামের কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে উক্ত কাজটি বিশুদ্ধ ইসলামি পদ্ধতিতে হতে হবে এবং দলীয় রাজনৈতিক কার্যাবলীতে পশ্চিমা নির্ভর কথিত উদার না হওয়া। এর মাধ্যমে প্রথম দিন থেকেই তালিবানরা তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার ও তাদের মূলনীতিকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করার জন্য পশ্চিমা আদর্শের ছাত্র ও তাদের চিন্তার দূতদের সামনে ফাঁকফোকর ও প্রবেশপথ বন্ধ করে দিয়েছে।

নিশ্চয়ই তালিবান নেতৃত্ব অত্যন্ত ভালোভাবে অনুধাবন করেছেন যে,যারা পশ্চিমাদের কোলে বড় হয়েছে এবং তাদের বস্তুবাদী আদর্শে আত্মতৃপ্ত হয়েছে,তারা ইসলাম ও মুসলিম জাতির জন্য কোনো আন্তরিকতা ধারণ করে না। কেননা জীবনের সকল ক্ষেত্রে এসব লোকদের হৃদয়ে যে আদর্শ রয়েছে,তা মূলত: পশ্চিমাদের আদর্শ। তাদের দৃষ্টিতে ইসলাম হচ্ছে কেবল একটি আধ্যাত্মিক শিক্ষা মাত্র,যার সাথে সরকারব্যবস্থা অথবা মানবজীবনের যাবতীয় বিষয়াদি পরিচালনার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের সবচেয়ে বড় আগ্রহ হচ্ছে পশ্চিমা ধাঁচে মুসলিমদের জীবন গঠন করা। আর যখনই এসব লোকেরা ইসলামি দলগুলোর নেতৃত্ব ও প্রভাবশালী অবস্থানে পৌঁছেছে,তারা মৌলিক বিষয়ে পশ্চিমা চিন্তাধারার সাথে সমন্বয় করার জন্য সেসব ইসলামি দলগুলোকে কলুষিত করা অথবা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য কাজ করেছে,যদিও নামের ক্ষেত্রে তাতে ভিন্নতা থাকে।

কিন্তু তালিবানদের এই অবস্থানের অর্থ এই নয় যে, যারা তাদের দ্বীন ও দেশের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ থেকে পশ্চিমা দেশে উপকারী জ্ঞান হাসিল করেছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও খনিজ সম্পদের মাধ্যমে উন্নতির জন্য তাদের দেশ ও জাতির সেবা করার জন্য ফিরে এসেছে, যা (আহরণের) জন্য সুদক্ষ হস্তের বিশ্বস্ত জ্ঞান প্রয়োজন, এমন অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ও প্রায়োগিক বিজ্ঞানের বিজ্ঞানীদের থেকে উপকৃত হওয়া যাবে না।

তালিবানদের এই নীতি গ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিক, চিন্তাগত, সাংস্কৃতিক এবং আইনগতভাবে (ইসলাম) বিদ্বেষী পশ্চিমা ছাত্রদের সামনে দেশ ও সরকারের নেতৃত্ব দেওয়ার

পথ বন্ধ করা। কেননা ইসলামি দলগুলোতে এধরণের ব্যক্তিদের উপস্থিতি কিংবা ইসলামি দলগুলোর নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব থাকা হচ্ছে দ্রবণীয় এসিডের মতো, যা তার চারপাশে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ক্রিয়া করে। বাস্তবে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অধিকাংশ ইসলামি দল কীভাবে তাদের কাজের শুরুর দিকে শক্তিশালী ইসলামি দল ছিল, যা উম্মতের যুবকদের মাঝে দ্বীনের মাধ্যমে ইজ্জতের চেতনা প্রবিষ্ট করেছিল এবং ইসলামি উম্মতের জন্য মহান খিদমত পেশ করেছিল। বরং এসব দল ইসলামি দেশকে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন থেকে মুক্ত করার জন্য সশস্ত্র জিহাদ এবং সামরিক প্রতিরোধে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু এতোসব কিছুর পর তারা চরম অধঃপতনে নিপতিত হয়।

পশ্চিমা কতিপয় নীতিমালার মাধ্যমে প্রভাবিত হওয়ার পর তারা উল্টোদিকে প্রত্যাবর্তন করল। তারা পশ্চিমাদের থেকে রাজনৈতিক কর্মসূচীর কতিপয় পন্থা গ্রহণ করল, অতঃপর তাদের মানহাজ পরিবর্তন হয়ে গেল। তাদের চিন্তাগত নীতি পরিবর্তন হয়ে এমন অবস্থায় পৌঁছে গেলো যে, এসব দলের একনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠাকারীগণ যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা থেকে পরিবর্তন হয়ে তারা ধর্মনিরপেক্ষতার অসুস্থতা প্রভাবিত আধা গণতান্ত্রিক দলে পরিণত হলো। আর তারা তাদের কার্যাবলী পশ্চিমা গণতান্ত্রিক মানদণ্ড দ্বারা পরিমাপ করতে লাগলো। এসব দল নতজানু নীতির অধিকারী জোটবদ্ধ সরকারে অংশগ্রহণ করে। আর তারা শাসনক্ষমতার নেতৃত্বে পৌঁছার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর তৈরি করা জোটের সাথে মিলিত হয়। যেনো ইসলামের নামে পরিচালিত এসব দলের প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে যেকোনো উপায়ে ক্ষমতার চেয়ারে আরোহণ করা। হোক সেটি বিশুদ্ধ ইসলামি চিন্তাধারা থেকে বের হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ দলসমূহ এবং সরকারের সাথে আপোষ করে অথবা পশ্চিমা পন্থায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই হোক, যেখানে মুমিনকে কাফিরের সমান,নেককারকে বদকারের সমান গণ্য করা হয় অথবা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসব দল ও পশ্চিমাদের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরির পথ প্রসারিত করার মাধ্যমে অথবা যেসব জিহাদি দল ইসলামি জিহাদের পথ অবলম্বন করে

ত্বগুত-কাফির ও দালাল সরকারগুলোকে নির্মূল করার পর ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সেসব জিহাদি দলগুলোকে নিন্দা জানানোর মাধ্যমে।

নিশ্চয়ই পশ্চিমা অনুকরণ ও প্রভাবের রোগে আক্রান্ত হয়েছে এসব দল সংখ্যায় মোটেও কম নয় এবং তারা ছোট দলগুলোর মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তারা অনেক এবং বিশাল বড়। এর দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় মিসর, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, সুদান, জর্ডান, তুরস্ক, আরব উপদ্বীপের দেশসমূহ, ভারত উপমহাদেশের দেশসমূহ, তাজিকিস্তানে এবং সর্বশেষে ইরাকে এসব দল আমেরিকা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সরকারে যোগদানের জন্য দখলদারদের অনুকূলে অবস্থান নিয়েছে।

আর আফগানিস্তান ! এখানে নিকট অতীতে যেসব দলকে জিহাদি ও ইসলামি দল হিসেবে নামকরণ করা হতো, যেসব দল জিহাদের পতাকা উত্তোলন করতো যেমনিভাবে তারা ইসলামি সরকারের নিদর্শনের মাধ্যমে আহবান করতো, আজ তারা ইসলামি বিশ্বে তাদের অনুরূপ দলের চেয়েও নিকৃষ্ট অবস্থায় পতিত হয়েছে। যেখানে ক্রুসেডাররা এই দেশ দখলের পর যে সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে, তাদের সবগুলো দল কোনো এক ক্ষেত্রে কিংবা ভিন্ন ক্ষেত্রে সেই আফগান দালাল সরকারের কাঠামোর পক্ষে ক্রুসেডারদের পতাকাতলে অবস্থান নিয়েছে। নিঃসন্দেহে এধরণের কিছু দল জিহাদ ও মুজাহিদদের প্রতি প্রকাশ্য শত্রুতার নীতি গ্রহণ করেছে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে দখলদার সরকারে যোগ দিয়েছে। আর অন্য কিছু দল পরিস্থিতির আলোকে চাতুরতা ও কল্যাণ লাভের নীতিকে ব্যবহার করে প্রকাশ্য ও সরাসরি ঘোষণার মাধ্যমে প্রধান দরজা দিয়ে সরকারে যোগ দেয়নি কিন্তু তাদের অধিকাংশ ব্যক্তি ও সাংগঠনিক পদধারীদেরকে বিভিন্ন নামে আবরণ দ্বারা ঢেকে রাখা বিভিন্ন ফাঁকফোকরের পথ ধরে প্রবিষ্ট করিয়েছে। অতঃপর উক্ত দলগুলোর অধিকাংশ ব্যক্তি দখলদারদের সরকারে যোগ দিয়েছে। আর তাদের অতি সামান্য কিছু জিহাদ ও মুজাহিদদের নাম ব্যবহার করে (ঈমান) সওদাকারী সরকারের বাইরে অবস্থান করছে। আর যখন ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদনে লালা ঝরতে থাকে তখন তারা কখনো কখনো এই দালাল সরকারের সাথে গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে আলোচনা চালিয়ে যেতে লজ্জাবোধ করে না। কিন্তু তা এই শর্তে যে, আফগানিস্তানে

দখলদারদের প্রতিনিধিত্বকারী সেই প্রশাসনে তাদেরকে বড় পদ দেওয়া হবে। আমরা যখন এসব আধা-সেক্যুলার দলগুলোর চিন্তাধারার মধ্যে বিচ্যুতির শিকড় অনুসন্ধান করবো, তখন দেখতে পাবো যে, নিম্নের দরজা দিয়ে এসব ফাসাদ তাদের দিকে পথ করে নিয়েছে।

১। জীবন ও কার্যক্ষেত্রে পশ্চিমা পন্থাকে গ্রহণ করা।

২। তাদের সারিতে পশ্চিমা শিক্ষার ছাত্রদেরকে (অনুসারী) কাজ করা ও প্রভাব বিস্তারে কর্তৃত্ব প্রদান করা।

৩। ইসলামের জন্য সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত কাজের ক্ষেত্রে আল-ওয়ালা ওয়াল-বারার (শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করার নীতি) নীতি থেকে খালি বা শুন্য হওয়া।

৪। জীবনধারণের প্রাচুর্যতা এবং দুনিয়াবি ভোগবিলাসের প্রতি লোভ এবং রাসূল সা. তাঁর সাহাবায়ে কিরাম রা. দেরকে যে কঠিন ও দৃঢ়তার জীবনের উপর তরবিয়ত বা প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন তা থেকে পলায়ন।

৫। বিশুদ্ধ একনিষ্ঠ ইসলামি চিন্তাধারার সাথে সংযুক্ত থাকতে লজ্জাবোধ করা, যাকে পশ্চিমা কাফিররা মৌলবাদ, চরমপন্থা, পশ্চাদপদতা ও অন্যান্য নামে আখ্যা দিয়ে থাকে।

৬। পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতার কতিপয় বাহ্যিক দিক দেখে চোখে ধাঁধাঁ লেগে যাওয়া এবং ইসলামি কাজে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সেগুলোকে স্থলাভিষিক্ত করা।

৭। পশ্চিমাদের সাথে মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে উঠতি প্রজন্মকে পরাজিত মানসিকতার উপদেশ শিক্ষাদান এবং তাড়াতাড়ি সংঘাতের সমাপ্তি করার জন্য পশ্চিমাদের সাথে কাজ করার উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা, যদিও তা একনিষ্ঠ ইসলামি চিন্তাধারা ও আকিদা এবং বিশুদ্ধ ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা (পরিত্যাগ) করার বিনিময়ে হয়।

৮। ত্বগুতি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই এবং বিশুদ্ধ ইসলামি মানহাজের ভিত্তিতে ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠার দিকে মনোনিবেশের পরিবর্তে ক্ষমতার নেতৃত্বে পৌঁছার জন্য সর্বাধিক মনোনিবেশ করা।

এছাড়াও আরো অনেক কারণ ও প্রভাবক রয়েছে যেগুলো ইসলামি দলগুলোর বিপর্যয়ের পথ প্রশস্ত করেছে।

আর মসজিদের মিহরাব ও বিশুদ্ধ ইসলামি মাদরাসার বারান্দা থেকে যাত্রা শুরু করেছে এমন ব্যক্তিরা তালিবান আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তা আজ পর্যন্ত এই বিপর্যয় থেকে মুক্ত। তালিবানরা পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে তাদের স্পষ্ট নীতি ও দুঃসাহসী প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রমাণ করেছে যে, তারা তাদের মূলনীতির ক্ষেত্রে কখনো আপোষ করবে না। তালিবান আন্দোলন তাদের অস্তিত্বের উপর পশ্চিমা আদর্শের ছাত্রদের (অনুসারীদের) ভয়াবহতার ব্যাপারে অসতর্ক নয়। একারণে তালিবানরা কখনো পশ্চিমাদের উপর মুক্তমনা হয়নি এবং পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে তাদের আদর্শিক লড়াইয়ের প্রত্যয়ে কোনো নমনীয়তা দেখায়নি। তালিবান আন্দোলন তাদের চলার পথে যতক্ষণ পর্যন্ত এই নীতি অবলম্বন করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কল্যাণের সাথে থাকবে ইনশাআল্লাহ্। এই আন্দোলনে সেদিন থেকে বিপর্যয় শুরু হবে, যেদিন থেকে পশ্চিমা চিন্তাধারায় লালিত-পালিত অথবা তাদের দ্বারা প্রভাবিত লোকদের জন্য তাদের নেতৃত্বের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।

৯. তালিবানদের চিন্তাধারায় নারী

তালিবানদের চিন্তাধারায় নারীদের ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা নিয়ে পশ্চিমারা অনেক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে এবং এটিকে তালিবানদের চিন্তাধারা ও শাসনের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডার উৎস বানিয়ে রেখেছে। পশ্চিমা মিডিয়া আফগানি নারীদেরকে নির্যাতিত ও আবদ্ধ হিসেবে চিত্রায়িত করেছে এভাবে: তারা অধিকারহীন, স্বাধীনতাবিহীন এবং আফগানি সমাজ বিনির্মাণে পুরুষের সাথে অগ্রসর হওয়া থেকে তাদেরকে অনেক দূরে রাখা আছে। আর নারীদেরকে শিক্ষা ও চাকরীর অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এভাবেই পশ্চিমা মুক্তচিন্তাধারী ব্যক্তিরা নষ্ট নারীদের অবস্থার সাথে আফগানি মুমিন নারীদেরকে মিলিয়ে ফেলেছে, যারা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে রব হিসেবে বিশ্বাস করে, যারা ইসলামকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হিসেবে এবং যারা উম্মুল মুমিনীন ও পূর্বসূরি

সচ্চরিত্র মুজাহিদ নারীদেরকে অনুসরণীয় মনে করে। কিন্তু পশ্চিমারা সর্বদাই নাস্তিক্যবাদী মিডিয়া ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে একচোখা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আফগান নারীদেরকে যাচাই করছে।

সুতরাং আফগান নারীদের অবস্থার বাস্তবতা কী ? এই মহান সৃষ্টির ক্ষেত্রে তালিবানদের দৃষ্টিভঙ্গি কী ? নারীদের উন্নতি-অবনতির ক্ষেত্রে তাদের চিন্তাধারার ভিত্তিগুলো কী ? আফগান নারীদের ব্যাপার নিয়ে পশ্চিমাদের বিতর্কের পিছনে মূল কারণ কী ?

আফগান নারীদের ব্যাপারে এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের কিছুটা পিছনের দিকে তাকানো প্রয়োজন। যাতে করে আফগানে পশ্চিমাদের নারী স্বাধীনতার বুলির বাস্তবতা বুঝতে পারি এবং কিভাবে তালিবানরা আফগানি নারীদেরকে পশ্চিমা চিন্তাধারায় গড়ে তোলার কার্যক্রমের সামনে কঠিন প্রাচীর হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিল ও মাথাগুলোকে ভেঙ্গে দিয়েছিল তা জানতে পারি,যা পুরু বিশ্বের শত্রুতাকে তাদের উপর টেনে এনেছিল।

নিশ্চয়ই তালিবানদের চিন্তাধারায় মুসলিম নারী হচ্ছে মুসলিম পুরুষের দ্বীনি বোন এবং দ্বীনের পক্ষ থেকে তাদের উপর আবশ্যক করে দেয়া শরিয়তের কর্তব্যসমূহের ক্ষেত্রে সমান দায়িত্বশীল। সে নারীর উপর কর্তব্য তার রবের শরিয়তকে আঁকড়ে ধরা, যেমন তার মুসলিম ভাইয়ের উপরও শরিয়তকে আঁকড়ে ধরা কর্তব্য।

ইসলামি সমাজে তার অবস্থান হচ্ছে সে হয়তো সম্মানিতা মা, স্নেহের বোন, আদরের কন্যা অথবা আনুগত্যশীলা স্ত্রী। সর্বাবস্থায় নারী হচ্ছে মর্যাদাবান মানুষ।

তার সাথে পুরুষের পার্থক্য হচ্ছে নারীকে সেবা করা হবে, আর পুরুষ হবে সেবক। কেননা ইসলামি শরিয়ত তার ভরণপোষণ, খরচ-পাতি, সম্মান-ইজ্জতের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব মুসলিম পুরুষের উপর দিয়েছে। আর এসবই তাকে দেওয়া হয়েছে, সৃষ্টির সময় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানসিক ও স্বভাবগত পার্থক্যের জন্যে। কারণ সে পুরুষের মতো কষ্টকর দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম হয় না।

সমাজের নারীদেরকে প্রতিষ্ঠা করা বা অবনতি হওয়ার ক্ষেত্রে তালিবানদের চিন্তাধারার মাপকাঠি হচ্ছে সেসমস্ত মানদণ্ড ও মূলনীতি যা ইসলাম দিয়েছে এবং এই উম্মাহর পূর্ববর্তী আলিমরা বর্ণনা করে গেছেন।

যেহেতু পশ্চিমা ক্রুসেডাররা তাদের নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারার কারণে পূর্ণ ইসলামকেই বিরোধীতা করে, তাই এটি কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, তারা নারীদের সফলতা বা বিফলতার ক্ষেত্রে তালিবানের মূলনীতিরও বিরোধিতা করবে।

পশ্চিমাদের চিন্তায় সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে, তারা বস্তুবাদী লিবারেল (মুক্তচিন্তা) দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আফগান নারীদের যাচাই করে। যদি তারা আফগানি মহিলাদেরকে তাদের দ্বীন, সামাজিক অবস্থান, শরিয়তের পক্ষ থেকে চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক কর্তব্য ও তাঁর জাতির সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখত, তাহলে আফগান মুমিন নারীদের ব্যাপারে তাদের মাথায় এরকম নষ্ট চিন্তা আসতো না।

পশ্চিমাদের মাথায় এই ভ্রান্ত চিন্তাধারা তৈরি হয়েছে মূলত তার সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য ও শত্রুতা এবং আফগান নারীদের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে, যারা এখনো পর্যন্ত এমন বীর প্রজন্ম জন্ম দিচ্ছে যারা বিগত দুই শতাব্দী যাবত ইংরেজ, রাশিয়ান, আমেরিকা ও তাদের ইউরোপিয়ান ক্রুসেডার বন্ধুদেরকে বিভিন্ন যুদ্ধে মস্তক অবনত করে দিয়েছে, যেসব যুদ্ধে হানাদার বাহিনী চরম লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করেছে।

যখন পশ্চিমারা দেখল, আফগান মুসলিম নারীরা অপসংস্কৃতির প্রচণ্ড স্রোতের সামনে দৃঢ়তার সাথে দন্ডায়মান এবং প্রতিরোধের ময়দানে বাবা, ভাই, স্বামী বা ছেলের সাথে একই সারিতে জিহাদ, হিজরত, সবর ও যুদ্ধের প্রস্তুতিতে অবস্থান করছে, তখন শত্রুরা নারীদের ক্ষেত্রে তাদের যুদ্ধের কৌশল পাল্টে ফেলে। তারা ইসলামি বিশ্বে তাদের সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ কর্তৃক ক্ষমতার মসনদে বসিয়ে রাখা গোলাম শাসক ও উম্মাহর গাদ্দারদেরকে দায়িত্ব দিল, যাতে ইসলামের মিথ্যা দাবীদার এই অপরাধীরা মুসলিম মহিলাদেরকে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনায় বাধ্য করে এবং আইন ও বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে তারা নারীদেরকে দ্বীনের বিধান থেকে বের করে তাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে।

আর এক্ষেত্রে আফগানিস্তানের ভাগ্য অন্যান্য ইসলামি দেশসমূহ থেকে ভিন্নরকম ছিল না। তখন বাদশা হাবিবুল্লাহ ক্ষমতায় আসে এবং সে তার অন্দরমহলে পশ্চিমা পোশাক এর প্রসার ঘটাতে শুরু করে।

এরপর ক্ষমতায় আরোহণ করে তার ছেলে বাদশা আমানুল্লাহ। সে ছিল যুবক এবং লিবারেল (উদার) পশ্চিমা বিশ্বাসে প্রভাবিত। সে একবার আশ্চর্যজনকভাবে ইউরোপ সফরে গিয়ে সেখানে ছয় মাস কাটিয়ে দেয়। তখন তার সাথে স্ত্রী আফগানি পোশাক পরিহিত অবস্থায় ছিল। কিন্তু সে উক্ত সফর থেকে ফিরে আসে পশ্চিমা পা খোলা পোশাক পরে। এরপর পশ্চিমা বিশ্বাসে প্রবাহিত বাদশা জিহাদ ও মুজাহিদিনের দেশে পশ্চিমা পোশাক বিস্তার করার জন্য সরকারি বড় বড় আমলাদের মজলিসে তার স্ত্রীকে উড়না খুলে ফেলার আদেশ দেয় এবং পুরুষদের মাঝে মাথা খোলা,বুক উন্মুক্ত অবস্থায় বসে। তখন বাদশা মন্ত্রীদের স্ত্রীদেরকেও এই কাজ করার কথা বলে। আর এভাবেই নারীদেরকে উলঙ্গ করার আন্দোলন এবং তাদেরকে শরয়ি পর্দা থেকে বের করে দেওয়ার কাজ শাসকের অন্দরমহল ও প্রাসাদ থেকেই শুরু হয়।

এরপর ক্ষমতায় আসে ফ্রান্সে বেড়ে ওঠা মুক্তচিন্তায় লালিত বাদশা জহির শাহ। সে ব্যাপকভাবে মহিলাদেরকে বেহায়াপনা করার সুযোগ দিয়ে দেয়। পুরো দেশে সহশিক্ষা চালু করে এবং চরিত্র ধ্বংসের সমস্ত মাধ্যম ও রাস্তা খুলে দেয়। পুরো জাতির দ্বীন ধ্বংসের জন্য তারা দেশে দ্বীন (ইসলাম) কে জাতির জন্য আফিম মনে করা নাস্তিক্যবাদী কমিউনিজমের বীজ বপন করে।

অতঃপর তার উত্তরাধিকারী হয় তার চাচাতো ভাই (মুহাম্মদ দাউদ), যে একই ধারাবাহিকতায় কার্যক্রম চালিয়ে নিতে থাকে কমিউনিস্টরা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে হত্যা করার আগ পর্যন্ত। তখন কমিউনিস্টদের সাথে দেশে সোভিয়েত দখলদাররাও চলে আসে এবং লাল কুকুরদের সামনে দেশের সমস্ত দরজা খুলে যায়, যাতে তারা শহরের নারীদের অন্তরের অবশিষ্ট চরিত্র, দ্বীন, সততা ও লজ্জা-শরমকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

পরবর্তীতে যখন কমিউনিস্ট সরকারের পতন ঘটে এবং জিহাদি দলগুলো রব্বানীর নেতৃত্বে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন রব্বানী প্রশাসন শরিয়ত বাস্তবায়ন ও কমিউনিস্টদের রেখে

যাওয়া অসৎ কাজগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বরং কমিউনিস্টদের সাথে মিলে অন্যান্য দলগুলোর সাথে বিবাদে লিপ্ত থাকে। দেশটিকে একটি ভয়ংকর গৃহযুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। যার ফলে লাখ লাখ মানুষ যুদ্ধ থেকে বাঁচার জন্য দেশ ছেড়ে পশ্চিমা দেশে পলায়ন করতে বাধ্য হয়।

এই পরিবারগুলো পশ্চিমা বিশ্বে পৌঁছার সাথে সাথেই পশ্চিমা সমাজ তাদেরকে লুফে নেয়, যাতে তাদের নষ্ট সংস্কৃতি দ্বারা তাদেরকে রাঙ্গিয়ে ফেলতে পারে এবং তাদেরকে বিষাক্ত ছোরার মতো ব্যবহার করতে পারে, যা দ্বারা আফগান মুসলিম সমাজের চরিত্রের মূলে আঘাত করতে পারে।

পরবর্তীতে যখন তালিবানরা অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার পর ক্ষমতায় আরোহণ করে তখন বিশাল আফগানি সমাজকে চরম পর্যায়ের চারিত্রিক অধঃপতনে নিমজ্জিত দেখতে পায়। যা সংক্ষেপে আমরা নিচে পয়েন্ট আকারে উল্লেখ করব:

১- ধারাবাহিক ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের পক্ষ থেকে নারী অঙ্গনে প্রচলন ঘটানো চারিত্রিক অধঃপতন।

২- কথিত নারী স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে বিশ্বাস করা নাস্তিক্যবাদী কমিউনিস্টদের প্রচলন ঘটানো দ্বীনি ও চারিত্রিক বিপর্যয়।

৩- পাপাচারী পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ থেকে ফিরে আসা বিশাল সংখ্যক আফগান জনগণের মাধ্যমে সৃষ্ট অশ্লীলতা।

৪- ধর্মনিরপেক্ষ ও কমিউনিস্ট সরকারের পক্ষ থেকে শরিয়তের হুদুদ বাস্তবায়ন বাতিল করা।

৫- অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেওয়ার বিভিন্ন মাধ্যম ব্যাপক করা, যেমন সিনেমা,নাটক,ক্লাব, মিডিয়ার মাধ্যমে যেমন রেডিও টেলিভিশন, অশ্লীল পত্রিকা-ম্যাগাজিন, ফ্রি বইগুলোকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে ছড়ানো হয়েছিল।

৬- অশ্লীলতার বিরুদ্ধে (নামধারী) মুজাহিদিন সরকারের (কমিউনিস্ট সরকারের পতনের পর যে সরকার গঠিত হয়) কার্যক্রমকে দুর্বল করে দেওয়া এবং সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের অশ্লীল বিভিন্ন কার্যক্রমে জড়িত হওয়া।

৭- শিক্ষার প্রত্যেকটি স্তরে সহশিক্ষার ভয়ংকর খারাপ প্রভাব বিস্তার।

৮- সরকারি এবং শিক্ষা খাতের প্রত্যেকটি স্তরে ইসলামি পোশাক নিষিদ্ধ করা।

৯- পশ্চিমা ও কমিউনিস্ট মিডিয়া থেকে প্রসারিত মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ।

১০-ত্রাণ,শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন সেবার ব্যানারের আড়ালে এনজিও সংস্থাগুলো আফগানদের মাঝে পশ্চিমা সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য শত শত প্রতিষ্ঠান তৈরি।

এসব কারণ এবং আরো অনেক কারণ বিশেষ করে নারী অঙ্গনে এবং যুবকদের মাঝে ভয়ানক পরিবেশ তৈরি করেছিল।

বিদ্যমান এই নষ্টামির প্রতিরোধে তালিবানদের কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়েছিল। কারণ তার থেকে বেশি শক্তিশালী কার্যক্রম ব্যতীত এই ব্যাপক অশ্লীলতাকে সংশোধন করা সম্ভব ছিল না। তাই তালিবানরা নিচের পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

১- নারীদের শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে আলাদা পরিবেশ,কারিকুলাম,আইন-কানু ও বিল্ডিং তৈরি করা পর্যন্ত তাদের সহশিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া। এর উদ্দেশ্য কখনো নারীদের শিক্ষা বন্ধ করে দেওয়া ছিল না। বরং রাষ্ট্রীয় সংবিধানে নারীদের শিক্ষার সুযোগ প্রদানের জন্য সুস্পষ্ট বিধান উল্লেখ ছিল। এমনকি সংবিধানের ৩৯ নং ধারায় উল্লেখ ছিল,"ইসলামি শরিয়তের কাঠামোর আওতায় বিশেষ আইনের মাধ্যমে নারীদের শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।"

২- নারীদেরকে সমস্ত প্রশাসনিক কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া এবং তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা।

৩- শরিয়তের হুকুম বাস্তবায়ন ও অশ্লীলতার প্রসার বন্ধ করার জন্য পর্দাকে আবশ্যক করে দেয়া।

৪- শরিয়তের হুদুদ বা নির্ধারিত শাস্তিসমূহকে বাস্তবায়ন করা,এর মধ্যে রয়েছে রজম ও চাবুক মারার হদ।

৫- সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় গঠন করা। মানুষকে দ্বীনের ব্যাপারে সচেতন করা। আর যারা শুধু নাসিহার মাধ্যমে অশ্লীলতা থেকে ফিরে আসবে না তাদেরকে শৃঙ্খলা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

৬- পশ্চিমা সংস্থাগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের সমস্ত কার্যক্রমের উপর নজরদারি করা।

৭- সন্দেহজনক সংস্থাগুলোকে মিডিয়ার মালিক হওয়া থেকে বিরত রাখা, যাতে করে মানুষের কাছে বিষাক্ত চিন্তাধারা প্রসার করা থেকে বাঁধা দিয়ে সমাজকে রক্ষা করা যায়।

যখন পশ্চিম ক্রুসেডার ও অশ্লীলতার ধারক রাষ্ট্রগুলো এ সমস্ত কার্যক্রম দেখলো এবং জানতে পারলো যে, তাদের ভ্রান্ত চিন্তা ও কুফুরি দৃষ্টিভঙ্গি আফগান নারী এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। তখন তারা বাঁশিতে ফু দেওয়া শুরু করল এবং তাদের দাবিতে আফগান নারীদের হারিয়ে যাওয়া অধিকার ফিরিয়ে আনার দাবি জানাতে শুরু করল, পশ্চিমারা যা নষ্ট করে দেয়ার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে।

আফগান নারীরা অনেকাংশেই অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের নারীদের তুলনায় ভিন্ন। এই ভিন্নতার দৃষ্টান্ত হচ্ছে,আফগান নারীরা এখনো আল্লাহর রহমতে তাদের বিশুদ্ধ ঈমানি স্বভাবের উপর অটল রয়েছেন এবং তাদের চিন্তাধারা পশ্চিমাদের বস্তুবাদী দূষণের দ্বারা দুষিত হয়ে যায়নি। তারা আজও পর্যন্ত হিজরত ও জিহাদের উপর অটল রয়েছেন। এখনো তারা দৈনিকের খাবারের উপরে ধৈর্য ধরে থাকে এবং তারা অদ্যাবধি পবিত্রতা ও সতীত্বকে অবাধ মেলামেশা ও উলঙ্গপনার ওপর প্রাধান্য দিয়ে আসছে। ফলে এই গুণই তাদেরকে ইসলামি মূলনীতির ভিত্তিতে একটি ঈমানদার প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুত করেছে, যারা নিজেদের সর্বশক্তি দিয়ে তাদেরকে রক্ষা করবে। আর তাদের মধ্যে এই বিষয়টিকে পশ্চিমারা মেনে নিতে পারছিল না।

আফগানিস্তানের উপর যখন আমেরিকা হামলা করল তখন পশ্চিমারা আফগান মহিলাদের প্রতি তাদের সুপ্ত বিদ্বেষ প্রকাশ করা শুরু করল। এই ভূখণ্ডে মুসলিম নারীদেরকে নষ্ট করার

জন্য অসংখ্য ক্ষেত্র তৈরি করে দিল। এই অশ্লীলতার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যাপকভিত্তিক নীতিমালাও প্রণয়ন করল। তাদের এই শয়তানি চক্রান্তের মূল ভিত্তিগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১- ইসলামি পর্দা থেকে নারীদেরকে বের করতে এবং এটিকে তালিবান শাসনের সাথে যুক্ত একটি বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে ছুড়ে ফেলতে উৎসাহিত করা। ফলে যতদিন তালিবানদের শাসন না থাকবে ততদিন পর্দারও অস্তিত্ব থাকবে না। এক্ষেত্রে আফগানিস্তানকে উদ্দেশ্য করে পশ্চিমা মিডিয়াগুলো অত্যন্ত ক্ষতিকর কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২- 'নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়' নামে নারীদের জন্য একটি মন্ত্রণালয় গঠন করা। যাতে মনে হয় নারীদের বিষয়টি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার জন্য একটি বিশেষ মন্ত্রণালয় প্রয়োজন। তবে এই মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীদেরকে সুনির্দিষ্ট কাঠামোর আওতায় ও পরিকল্পিতভাবে নষ্ট করে দেয়া, যা আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে এই আশ্চর্যজনক মন্ত্রণালয় পরিচালিত হবে এবং সম্ভবতঃ বিশ্বের মন্ত্রণালয়ের ইতিহাসে এটিই ছিল সবচেয়ে অদ্ভুত মন্ত্রণালয়।

৩- জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদেরকে পুরুষের সাথে মিশে যাওয়ার রাস্তা খুলে দেওয়া। একেবারে রাজনীতি থেকে শুরু করে শিক্ষা, ব্যবসা, খেলাধুলা, প্রতিযোগিতা,বিনোদন, নাইটক্লাবে অংশগ্রহণ, অশ্লীল শিল্পকলা যাকে তারা সুস্থ-সুন্দর শিল্পকলা নাম দিয়েছে এবং সাংবাদিকতা ও মিডিয়াসহ জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই।

৪- অসংখ্য টেলিভিশন চ্যানেল খোলা এবং সেখানে সুন্দরী নারীদেরকে উপস্থাপন করা। উদাহরণস্বরূপ: টেলিভিশন সম্প্রচারের জন্য শুধু কাবুল শহরে ২০ এর অধিক বেসরকারি টেলিভিশন স্টেশন রয়েছে এবং রাজধানীসহ আফগান প্রদেশসমূহে সরকারি ও বেসরকারি ২০০ এর অধিক রেডিও স্টেশন রয়েছে। এগুলো থেকে তারা এতো নিকৃষ্ট ধরনের অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও ফাসাদ ছড়িয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সরকারের কিছু সংস্থা সরকারের কাছে এসব চ্যানেলের উপর নৈতিক নজরদারি করতে আহবান জানিয়েছে। যেহেতু এসব চ্যানেল

সমাজের নৈতিক ভিত্তি ভেঙ্গে ফেলার জন্য বিচিত্র সব অসভ্যতা উদ্ভাবন করেছে।

কিন্তু এই চ্যানেলগুলো তাবেদার শাসকের আরোপিত নিয়ম-কানুন থেকেও অধিক শক্তিশালী, কারণ এসব চ্যানেলের পেছনে সরাসরি পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ রয়েছে।

৫- আফগানের নতুন প্রজন্মকে পশ্চিমা সমাজের তিনটি মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছেঃ-

প্রথমত: পুরুষ এবং নারীকে সমস্ত বিষয়ে সমতা দেওয়া।

দ্বিতীয়ত: জীবনযাপনের ক্ষেত্রে নারীদেরকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া, যাতে তার ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সে যখন আর্থিকভাবে স্বামী থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যাবে তখন কেন সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে থাকবে? তার তো তাকে শুধু শারীরিক প্রয়োজন ব্যতীত আর কোনো ক্ষেত্রে দরকার নেই! এই জৈবিক চাহিদাকে সে কেন বিবাহের মত আবদ্ধ ও কষ্টকর সিস্টেমের পরিবর্তে স্বাধীনভাবে পূরণ করবে না ?

তৃতীয়ত: পবিত্র ও সুশৃঙ্খলভাবে সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামের পক্ষ থেকে দেওয়া সীমাকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য নারী-পুরুষকে সম্পূর্ণভাবে একত্রিত করে দেয়া।

৬- বই, ম্যাগাজিন, ছবি, সিনেমা, গান-বাজনা এবং নাইট ক্লাবের মাধ্যমে যৌন সুড়সুড়ি প্রদানের সকল ব্যবস্থাকে অবাধ করে দেওয়া। পুলিশের পক্ষ থেকে রাত্রিকালীন নৈতিক নজরদারি উঠিয়ে নেওয়া, অশ্লীল বাজনা প্রচার করার জন্য অসংখ্য রেডিও স্টেশন খোলা এবং সেগুলোতে যুবক যুবতির মধ্যে আলাপের ব্যবস্থা করা।

৭- গেস্ট হাউজের নামে অসংখ্য পতিতালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং সেখানে চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ও প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পতিতাদেরকে আনা হয়েছে। এই ক্লাবগুলো রাজধানী কাবুলে এত পরিমাণ বেড়ে গেছে যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেগুলোকে চূড়ান্ত পর্যায়ে অশ্লীলতা ছড়ানোর ফলে বন্ধ করে দেওয়ার আদেশ দিচ্ছে। আফগানি যুবকরা প্রকাশ্যে এসব প্রত্যাখ্যান করে আসছে, যেহেতু এগুলো শুধু বিদেশীদের জন্য ছিল।

৮- এইডস নির্মূলের অজুহাতে আফগানি সমাজের মাঝে পশ্চিমা সংস্থাগুলো লক্ষ লক্ষ জন্মনিয়ন্ত্রণ মাধ্যম ছড়িয়ে দিচ্ছে। মূলত: এসবের মাধ্যমে আফগানি সমাজে ব্যভিচারের অশ্লীলতাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

৯- আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার জন্য খেলার অনেক দল তৈরি করা হয়েছে এবং তাদেরকে বহির্বিশ্বে প্রেরণ করছে।

১০- জাতীয় আদালতের পার্শ্বে নারী অধিকার সংরক্ষণ অফিস গঠন করেছে। ফলে যারা স্থানীয় বিচারালয়ে যেতে চায় না, তারা যাতে তাদের কাছে যেতে পারে। এসবের মধ্যে কিছু শরিয়তের বিধানও রয়েছে, যদিও তা শুধু কাগজে লেখামাত্র (অর্থাৎ যার কোনো বাস্তবায়ন নেই)।

১১- নারীদেরকে ঘি ও অন্যান্য খাবার সরবরাহের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়তে যাওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। অথচ ছেলেদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

পশ্চিমা ক্রুসেডাররা নারীদের জন্য এই সব কিছু এজন্য করছে না যে, সে নারী। বরং তারা আফগানি নারীদেরকে তাদের ঈমানী স্বভাব চরিত্র থেকে বের করার জন্য তা করছে। যাতে করে সে নারীত্বের পবিত্র স্বভাব হারিয়ে পুরুষ বা পুরুষের অনুরূপ হয়ে যায়। যাতে তারা তাকে তার ঘরের বাইরে নিয়ে আসতে পারে এবং সন্তানদেরকে পশ্চিমা ও হিন্দি ফিল্মের সামনে ছেড়ে দিবে, যার থেকে তারা আদর্শ ও জীবন যাপনের পদ্ধতি গ্রহণ করবে।

অন্যদিকে চরিত্রবান মুমিন নারীরা সর্বদাই তাদের চোখের কাঁটা হয়ে আছে। সেখানে তাদের কোনো স্থান নেই বরং তারা হত্যা, ধ্বংস, রাতের অন্ধকারে বাড়িতে হানা দিবে এবং স্বামীদেরকে তাদের চোখের সামনে হত্যা করবে, আর সে আর্তচিৎকার করবে এটিরই উপযুক্ত। তারা পশ্চিমাদের কাছে বাড়ি বোম্বিং করে সন্তানদেরকে হত্যা করার উপযুক্ত কেননা সে মুজাহিদের স্ত্রী অথবা এমন যুবকের মা যার মুজাহিদ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তার প্রাপ্য হচ্ছে তার বাড়িঘর চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হবে। অথবা তাকে জেলে নেওয়া হবে আর সে আর্তচিৎকার করে বলতে থাকবে "ওয়া মো'তাছিমাহ !"

সুতরাং এখানে মূল বিষয় হচ্ছে নারীদের ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এটি তাদের অধিকার রক্ষা বা তালিবানদের বিরুদ্ধে তাদের বিজয়ের বিষয় নয়।

অন্যদিকে নারীদের ক্ষেত্রে তালিবানের চিন্তাধারা হচ্ছে সেই ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, যা তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে গেঁথে রয়েছে। তারা ওই নারীদের সন্তান, তারা তাদের দুধ পান করেছে,

তাদের কোলে বড় হয়েছে এবং তাদের আচলের ছায়াতে ইসলামি শিক্ষায় দীক্ষিত হয়েছে। তাই তারা নিজের রক্ত ও হাড় বিলিয়ে দিয়ে তার সম্মান ও ইজ্জতের প্রতিরোধ করবে। তারা কখনোই নারীদেরকে পশ্চিমা শয়তানি শক্তি এবং প্রাচ্যের দাজ্জালি শক্তির হাতে খেলার বস্তুতে পরিণত হওয়াকে সহ্য করবে না।

মূলত তারাই হচ্ছে নারীদের এবং নারীদের দ্বীনি অধিকার সংরক্ষণের বাস্তবিক শক্তি, যারা তাদেরকে পশ্চিমা পাপাচারী নেকড়েদের হাত থেকে রক্ষা করছে।

১০. জিহাদের ব্যাপারে তালিবানদের চিন্তাধারা

এখানে অনেক ইসলামি দলই ইসলামের জন্য কাজ করার দাবি করে কিন্তু তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও যুদ্ধের ব্যাপারে নেতিবাচক অবস্থান ধারণ করে। এটি হয়তো ইসলামি কার্যক্রমে গুরুত্বের তারতম্যের বিষয়টি না জানার কারণে অথবা ইসলাম সম্পর্কে অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত বুঝের কারণে;ফলে সে ইসলামকে কিছু প্রথা বা বিভিন্ন উপলক্ষে পঠিত দোয়ার সমষ্টি মনে করে অথবা আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের প্রতি তার ইখলাস ও একনিষ্ঠতা না থাকার কারণে অথবা ইসলামকে বুঝার ক্ষেত্রে বক্রতা থাকার কারণে, যা সে পেয়েছে প্রাচ্যবাদী উৎস থেকে ইসলাম শিক্ষার ফলে অথবা দুনিয়ার লোভ ও সরকারি পদের আশায় ত্বগুতের সাথে ওঠাবসার কারণে অথবা জিহাদ ও ক্বিতাল, আঘাত, জেলখানা, হিজরত ও ই'দাদের মতো ভয় সঙ্কুল কঠিন পথে চলার কষ্ট সহ্য করার দৃঢ় সংকল্পের ঘাটতির কারণে।

এছাড়াও আরো কিছু ইসলামি দল আছে যারা শুধু জিহাদের আলোচনা করে কিন্তু তারা এটিকে শুধু নিদর্শনের গন্ডিতেই আবদ্ধ রাখে। এপথে কুরবানী পেশ করা বা যুদ্ধের ময়দানে বের হওয়ার বাসনা রাখে না। বরং শুধু সমর্থন বা মাঝে মাঝে অন্যদের জিহাদের আলোচনায় তাকবির দিয়ে বসে থাকে যতক্ষণ দুনিয়ার কিছু সম্মান-সম্পদ পায় ও উক্ত জিহাদের ব্যাপারে প্রশাসন দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখে। কিন্তু যদি প্রশাসন তাদের জিহাদকে প্রত্যাখ্যান করে অথবা জিহাদের ঝাণ্ডাবাহী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তাহলে তারা অতি দ্রুত জিহাদের

আলোচনা থেকে দূরে সরে এই গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শাসকদের প্রতি বন্ধুত্ব নবায়ন করে, যাতে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, চরমপন্থার বিরোধিতা ও পশ্চিমা পাপাচারীরা বাঁশিতে ফুঁৎকার দেয় এমন অন্যান্য চিন্তাধারায় বিশ্বাসী সুশীল সমাজের মধ্যে তাদের অবস্থান নষ্ট না হয়।

অন্যদিকে তালিবান আন্দোলন যা বর্তমান যুগে জিহাদরত সবচেয়ে বড় ইসলামি আন্দোলন, যারা আফগানিস্তানে বৈশ্বিক ক্রুসেডার জোটের বিরুদ্ধে ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধের কঠিন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এই যুদ্ধে তারা সব ধরনের ত্যাগ-কুরবানী করেছে এবং নিজেদের মধ্যে এই সংকল্প করেছে যে, তারা ত্বগুত ও কুফরের সাথে আপোষ করবে না। তারা সেই সমস্ত কাফির ও তাদের দালালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে যারা প্রকাশ্যে ক্রুসেডের পতাকার অধীনে একত্রিত হয়েছে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের সাহায্য করছে। যদিও সেই দোসররা ইতোপূর্বে ইসলামিস্ট এবং জিহাদি নামের আড়ালে নিজেদেরকে আড়াল করেছে।

তাহলে জিহাদের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী ?

বর্তমান যুগে জিহাদের চাহিদার ক্ষেত্রে তাদের উপলব্ধি কী ?

জিহাদ-ক্বিতাল থেকে তাদের লক্ষ্য কী ?

বৈশ্বিক ক্রুসেডার জোটের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য তাদের প্রস্তুতি কী ?

ইসলামি বিশ্বে অন্যান্য জিহাদি জামা'আতের প্রতি এই আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি কী ?

এগুলো সহ আরো বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য বিশ্বের মুসলিমরা আগ্রহ অনুভব করে। তারা জিহাদ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে এই আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে পরিস্কারভাবে জানতে আগ্রহ বোধ করে। আমরা এগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব বি-ইযনিল্লাহ।

১০.ক) জিহাদের ব্যাপারে তালিবানদের দৃষ্টিভঙ্গি:

নিশ্চয়ই তালিবান আন্দোলনের দৃষ্টিতে জিহাদ কোনো রাজনৈতিক প্রতিরোধ নয় অথবা জাতীয় লক্ষ্য বা দেশীয় স্বার্থ এবং পার্থিব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সশস্ত্র যুদ্ধের আন্দোলন নয়। তেমনিভাবে ভিনদেশী দখলদারদের থেকে দেশকে স্বাধীন করার আন্দোলন নয় যেখানে দেশীয় ত্বগুতরা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তা বাদ দিয়ে ইহাকে পরিচালিত করবে। বরং এটি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ইবাদত, যে পথে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করা হবে।

।জিহাদ ইসলামের সবচেয়ে সম্মানিত ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত, যাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

জিহাদ শব্দটি ব্যাপকার্থক একটি শব্দ, যা আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা এবং ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সব ধরনের চেষ্টা-সাধনাকে অন্তর্ভুক্ত করে, তা হারব শব্দ থেকে ভিন্ন, যা শুধু যুদ্ধকেই বুঝিয়ে থাকে।

তালিবানদের দৃষ্টিতে জিহাদ শুধু লক্ষ্যহীন যুদ্ধ করা নয়। বরং এটি আল্লাহর পথে না হলে এবং এর দ্বারা ফিতনা নির্মূলের উদ্দেশ্য না থাকলে তা জিহাদ হিসেবে গণ্য হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ

“তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়, তাহলে জালেম ছাড়া অন্য কারোর প্রতি শত্রুতা নেই।“

[সূরা বাকারা-১৯৩]

আল্লাহ তায়ালা জিহাদ দ্বারা সন্তুষ্ট হবেন না, যদি উদ্দেশ্য আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা না হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা (দ্বীন)কে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করবে, সেই শুধু আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে"। (বুখারি ও মুসলিম)

এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা কোনো জিহাদ ততক্ষণ গ্রহণ করবেন না, যতক্ষণ না তা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশেই হয়ে থাকে এবং তার সন্তুষ্টি কামনা করা হয়, যাতে নিজের অথবা দলের অথবা জাতির কোনো স্বার্থ জড়িত থাকবে না।

সুতরাং এই অর্থে জিহাদ হল মূলত: আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা এবং আল্লাহর দ্বীনের দিকে হিদায়াত থেকে মানুষকে সরিয়ে দেয় এমন সকল অপচেষ্টা ও ফিতনাকে নির্মূল করার এক ধারাবাহিক প্রচেষ্টা।

জিহাদ হচ্ছে, কুফফারদের সাথে যুদ্ধ যতক্ষণ না মুসলিম উম্মাহ কুফফারদের নির্যাতন থেকে নিরাপদভাবে বসবাস করতে না পারে এবং তাকে যেন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ওয়াজিব বাস্তবায়ন করা থেকে কেউ বাঁধা দিতে না পারে, যার জন্যে এই উম্মাহকে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রথম দিন থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করেই তালিবান আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তালিবানরা কুফফারদের সাথে বন্ধুত্বকারী সেসব দলের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল , যারা বিদেশীদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে দেশের জনগণ ও ফল-ফসল ধ্বংস করে দিয়েছিল। এখন যখন তালিবানরা তাদের প্রতিরোধে নেমে আসলো, তখন সমস্ত কুফুরি শক্তি সেই দলগুলোকে সাহায্য করতে লাগল, যাদেরকে তালিবানরা নাম দিয়েছিল (নিকৃষ্ট ও বিশৃংখলাকারী দল)। সে সময় কিছু মানুষ এই ভ্রান্ত দলের ব্যাপারে তাদের নামকরণ মেনে নিতে পারছিল না। কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধের জন্য আফগানিস্তানে আমেরিকা আক্রমণ করার পর যখন এসব দল ক্রুসেডারদের পতাকাতলে একত্রিত হয় তখন তাদের দাবির বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যায়।

১০.খ) বর্তমান সময়ে জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার ব্যাপারে আকিদাঃ

তালিবান আন্দোলন বিশ্বাস করে বর্তমান সময়ে জিহাদ ফরজে আইন। ফরজে আইন হচ্ছে ওই ফরজ যা প্রত্যেক মুসলিমের উপর করা আবশ্যক। যেমন: সালাত এবং সাওম।

বিশেষ কিছু অবস্থায় আহলে সুন্নাহ ওয়ালা জামাআহর সমস্ত মাযহাবে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। যেমনটা বর্তমান সময়ের ইমামুল জিহাদ বা জিহাদের ইমাম শহিদ শাইখ আব্দুল্লাহ আজ্জাম (রাহিমাহুল্লাহ) উনার প্রসিদ্ধ পুস্তিকা "মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরজ"-কিতাবে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরাম এবং বর্তমান সময়ে যাদের দ্বীন ও ইলমের উপর নির্ভর করা যায় এমন সব উলামায়ে কেরামের থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তা নিম্নরূপঃ-

১- যদি কাফিররা মুসলিমদের কোনো ভূখণ্ডে প্রবেশ করে।

২- যখন দুই দল মুখোমুখি হবে এবং দুই দল যুদ্ধ শুরু করবে।

৩- ইমাম যখন নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি অথবা জাতিকে বের হতে বলেন, তখন তাদের উপর বের হওয়া ফরয হয়ে যায়।

৪- যখন কাফিররা মুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু ব্যক্তিকে বন্দী করে।

যদি উপরে বর্ণিত অবস্থা সমূহের শুধু একটি অবস্থা সংঘটিত হলে সমস্ত সালাফ ও খালাফ (তথা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইমামগণ) জিহাদ ফরজে আইনের ব্যাপারে একমত হন, তাহলে বর্তমান যুগে কেন ফরজে আইন হবে না অথচ একই সময়ে সমস্ত কারণ পাওয়া যাচ্ছে !যখন কাফিররা জোরপূর্বক মুসলিমদের অসংখ্য শহরে যুদ্ধরত অবস্থায় প্রবেশ করেছে, দশকের পর দশক ধরে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলছে এবং যত দিন যাচ্ছে তার তীব্রতা আরও বাড়ছে। ইহুদী, খ্রিস্টান,কমিউনিস্ট ও মানুষের মধ্যে অন্যান্য নাস্তিক্যবাদীদের শত্রুতা প্রতিরোধে বের হওয়ার জন্যে পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমের মুসলিমদেরকে মুসলিমদের শরিয়তসম্মত আমীররা আহবান করছেন।

আর মুসলিমদের বন্দিত্বের ব্যাপারে তো বলার অপেক্ষা রাখে না। কুফফারদের কারাগারে হাজারো মুসলিম বন্দি রয়েছে, যাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।

আফগানিস্তানের জিহাদ হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরজের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এখানে কুফুরি শক্তির মাথা আমেরিকার নেতৃত্বে সমস্ত ক্রুসেডার রাষ্ট্রসমূহ তাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে, তারা ইমারাতে ইসলামিয়ার পতন ঘটিয়েছে এবং এই রাষ্ট্রটিকে আগুন এবং লোহা অর্থাৎ বোমা ও গুলির শক্তি দ্বারা দখল করে রেখেছে।

এখন যারা জাতিসংঘের অনুমোদনের দোহাই দিয়ে আফগানিস্তানে আমেরিকার হামলাকে বৈধতা দিচ্ছে, তারা অন্য একটি ভয়ানক কুফরীতে লিপ্ত। তা হল আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কারো কাছে ফায়সালা চাওয়া এবং ত্বগুতের বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। জাতিসংঘ কুফুরি প্রতিষ্ঠান হওয়ার ব্যাপারে কোনো মুমিন সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। জাতিসংঘ তৈরি হয়েছে বড় বড় কুফুরি রাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য। সুতরাং ইসলামি শরিয়তের বিপরীত জাতিসংঘের সনদের ফায়সালা চাওয়া, যা ইসলামি বিশ্বের উপর অপদস্থতা ও লাঞ্ছনাকে টেনে নিয়ে আসছে;তা হচ্ছে ত্বগুতকে বিধানদাতা বানানো এবং মুসলিম জাতির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কুফুরির উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া।

বর্তমান সময়ে সশস্ত্র জিহাদ শুধু ফরজে আইন নয় বরং তা নির্যাতিতদের স্বভাবগত প্রয়োজন, যেন তারা নিজের উপর থেকে অপদস্থতা ও নির্যাতনকে প্রতিরোধ করে। কারণ পশ্চিমারা কখনো আমাদের উপর শত্রুতা, আমাদের শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, আমাদের দেশগুলো দখল করা ,আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিকে পরিবর্তন করে দেওয়া এবং আমাদের উপর নাস্তিক্যবাদী পুঁজিবাদী সভ্যতাকে চাপিয়ে দেওয়া থেকে পিছু হটবেনা, যতক্ষণ না ইসলামি বিশ্বে কোনো প্রতিরোধ শক্তি তৈরি হবে যারা তাদেরকে প্রতিরোধ করবে।

বর্তমানে কুফফারদের পক্ষ থেকে মুসলিমরা যেসকল আচরণ পাচ্ছে তা হচ্ছেঃ- মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, সম্পদ লুণ্ঠন করা, জনসাধারণকে অপদস্থ করা, রাষ্ট্র দখল করা, শহর সমূহ জ্বালিয়ে দেওয়া এবং লক্ষ লক্ষ টন আগুন ও লোহা অর্থাৎ বোমা ও গুলি মুসলিমদের ওপর

বর্ষণ করা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে জায়নবাদী ইহুদি শক্তিকে সাহায্য করা, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে মিশনারি এবং নাস্তিকতা ছড়িয়ে দেওয়া, পাপাচারী ও দ্বীন থেকে বের হওয়া মুরতাদদেরকে মুসলিমদের উপর শাসক বানানো, আল্লাহর দ্বীন ও নিদর্শনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে সংখ্যালঘু কাফিরদেরকে আন্তর্জাতিকভাবে সাহায্য করা, সেই সাথে মুসলিম উম্মাহর সৎ ও মুজাহিদ সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদের মাধ্যমে জেলখানাকে ভর্তি করা, দখলদার শক্তিসমূহকে ইসলামি বিশ্বের অর্থনীতির ওপর কব্জা করার সুযোগ দিয়ে দেওয়া, মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ও গোপনে আরো হাজারো রকমের অপরাধ সংগঠিত করা এবং সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ট্যাঙ্ক-বিমান, প্রশিক্ষিত সেনা-নৌবহর, ব্যাংক-অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, চারিত্রিক ও শিক্ষাগত হাজারো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলিমদের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাদেরকে দ্বীন ও বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করছে এবং তাদের দ্বীন ও পরকালের প্রেক্ষিতে যেসব জিনিস শিক্ষা আবশ্যক তা থেকে অজ্ঞ রাখছে।

অন্যদিকে জাতিসংঘ মুসলিমদের শত্রুদের খন্দকে অবস্থান নিয়েছে। মুসলিমদের যে সমস্ত ঝুলন্ত বিষয়গুলো রয়েছে যেমন কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, আসাম ইত্যাদি মুসলিমদের সমস্যার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের জুলুমের স্পষ্ট প্রমাণ।

মুসলিমরা তাদের উপর থেকে নির্যাতনকে দূর করার জন্য সমস্ত মাধ্যমে চেষ্টা করেছে। যেমন- (কাফিরদের সাথে) আপোষরফা, সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ,তাদের পেছনে লেগে থাকা, কুফফারদের সাথে সামরিক ও রাজনৈতিক চুক্তি, অত্যাচারী পশ্চিমা রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীনদের কাছে যাতায়াত,তাদের বস্তুবাদী নাস্তিক্যবাদী চিন্তা-চেতনা অর্থাৎ গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, কমিউনিজম এবং অন্যান্য সামাজিক জীবন পদ্ধতিসহ সমস্ত পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু তাদের উপর চলমান নির্যাতন একটুও কমেনি বরং তা দিন দিন আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা আল্লাহর নবীর সেই বাণীর প্রতিফলন হয়ে গেছে যাতে বর্ণনা করেছেনঃ "যদি তোমরা জিহাদ ছেড়ে দাও, ব্যবসা শুরু করো এবং গরুর লেজ ধরে থাকো, তাহলে

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর অপদস্থতা চাপিয়ে দিবেন এবং যতদিন তোমরা তোমাদের দ্বীনে অর্থাৎ জিহাদে ফিরে না আসবে, ততদিন তা তোমাদের থেকে তুলে নেওয়া হবে না"। সুতরাং যুদ্ধবাজ কুফফার ও মুসলিম ভূখন্ডে তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে জিহাদ শুধু ফরজ নয় বরং তা মুসলিমদের উপর আপতিত জুলুমের প্রতিরোধে একমাত্র প্রাকৃতিক সমাধান। কেননা কাফিররা কখনোই আলোচনা দিয়ে সন্তুষ্ট হবে না অথবা সমস্যার ন্যায়ভিত্তিক শান্তিপূর্ণ সমাধান মেনে নিবে না।

১.০.গ) তালিবানদের নিকট জিহাদের সুস্পষ্ট লক্ষ্য-

তালিবানদের নিকট জিহাদের লক্ষ্য সূর্যের মতো স্পষ্ট। তা হল, আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা, ইসলামি শরিয়তের পদ্ধতিতে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। তারা এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে কোনো ধরনের ঘাটতি বা কমতিকে মেনে নিবে না।

তারা এমন কোনো সরকার ব্যবস্থাকে গ্রহণ করবে না, যা নামে 'ইসলামি সরকার' হলেও বাস্তবে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার অথবা মানুষের ইচ্ছা দিয়ে বিচার ফায়সালা করে; তা যে নামেই হোক। এজন্য তারা (তালিবান) শাসন ব্যবস্থার কোনো অংশেও এমন কিছুতে সন্তুষ্ট নয়, যাতে বিচার ফায়সালা আল্লাহর শরিয়তের প্রতি সম্পৃক্ত হয় না।তাদের উপর বিপদ যত কঠিন-ই হোক না কেনো, তারা এই অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়নি। এক্ষেত্রে তাদের প্রত্যয় হচ্ছে, তাদের সরকারব্যবস্থা সত্যিকার অর্থে ইসলামি হবে অথবা এখানে কোনো শাসন ব্যবস্থাই টিকে থাকবে না। এজন্য তালিবানরা সরকারব্যবস্থা কোন ধরণের হবে সে ব্যাপারে কাফির ও তাদের দালালদের সাথে কোনো ধরনের সংলাপ বা বৈঠকে যাবে না। এটি তাদের নিকট একদম অকাট্য বিষয়, যা থেকে তারা কখনোই বিচ্যুত হবে না।

তালিবানরা একনিষ্ঠভাবে দ্বীন ইসলাম আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে পূর্ববর্তী জিহাদি দলগুলো থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম, যারা কমিউনিস্ট ও রাশিয়ানদের সাথে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু পরে তারা পশ্চিমা গণতন্ত্রের সাথে একমত পোষণ করেছিল এবং তাদের ধাঁচে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল এবং তারা মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের সাথে এক সারিতে অবস্থান করেছিল।

এ থেকে বুঝা যায়, তাদের জিহাদ আল্লাহর কালিমা/দ্বীনকে বুলন্দ করার জন্য ছিল না বরং শাসনক্ষমতার চেয়ারে আরোহণের জন্য ছিল। যখন তাদের জন্য সেই শাসনক্ষমতার চেয়ারে বসা সহজ হয়ে গেল, যা তারা ইসলাম ও শরিয়তের নামেই পেয়েছিল সেগুলোকে ছেড়ে দিলো এবং বৈশ্বিক ক্রুসেডারদের কোলে বসে গেল।

১০.ঘ) তালিবানদের জিহাদের প্রস্তুতি

নিশ্চয়ই জিহাদের প্রস্তুতি এবং আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া ও বিশ্বের অন্যান্য শক্তিশালী ও বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ যে বৈশ্বিক ক্রুসেডার জোটের নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। যেখানে যথাযথ শৃঙ্খলা,পরিকল্পনা ও ব্যাপ্তি অতীব প্রয়োজন। কেননা আক্রমণকারী দেশসমূহ বিশাল পরিমাণের সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মিডিয়ার সক্ষমতা উপভোগ করছে। অন্যদিকে তালিবানরা আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকেই তাদের পাশে পাচ্ছে না। তাই বর্তমান সময়ের জিহাদি প্রতিরোধ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপক্ষে জিহাদের সময় থেকে অনেক ব্যতিক্রম। কেননা বর্তমান সময়ে এই অঞ্চলের সকল রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আগ্রাসী ক্রুসেডার বাহিনীর সাথে শরিক হয়েছে। এসব রাষ্ট্র সম্পদ অথবা রসদ অথবা সৈন্য দ্বারা ক্রুসেডারদের সাহায্য করছে অথবা তাদেরকে বিমান ঘাঁটি, সামরিক ঘাঁটি ও অন্যান্য ঘাঁটিসমূহ ব্যবহারের সুযোগ দিচ্ছে।

কিন্তু এসমস্ত কিছু সত্ত্বেও তালিবানরা তাদের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং প্রতিরোধের সকল ক্ষেত্রে তাদের শক্তিকে সফলভাবে ও প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিল।

তালিবানরা নিম্নবর্তী ক্ষেত্রে সফলভাবে ও প্রভাব বিস্তারকারীরূপে প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিল:

১- অর্থনৈতিক প্রস্তুতিঃ তালিবানরা জিহাদ পরিচালনার জন্য তাদের অর্থনৈতিক যোগানকে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকেই পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিল। যেমন গনিমত, সাদাকাহ, যাকাত এবং মুসলিমদের মধ্যে দানের আগ্রহকে বৃদ্ধি করা এবং সেই উৎসসমূহকে সুন্দরভাবে সংরক্ষিত

রাখা। যাতে করে বৈশ্বিক ক্রুসেডাররা তাদের সর্বোচ্চ শক্তি ও মাধ্যম ব্যবহার করেও তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত মহান জিহাদের এই উৎসগুলোকে নিঃশেষ করতে না পারে।

ইহা প্রমাণ বহন করে যে, সম্পদের উৎসগুলোকে পরিচালনা করা ও অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে ব্যয় করার ক্ষেত্রে তালিবানরা শক্তিশালী সক্ষমতা রাখে। তেমনিভাবে এটিও প্রমাণিত হয় যে,এই মুসলিম উম্মাহ হচ্ছে নিজেদের মর্যাদা সংরক্ষণের পথে সবকিছু বিলিয়ে দেওয়া এক দানশীল উম্মাহ, যদিও সরকারগুলো তা করতে ব্যর্থ হয়।

২- সামরিক প্রস্তুতিঃ সামরিক প্রস্তুতিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন: যোদ্ধা ব্যক্তি, পর্যাপ্ত অস্ত্রের মজুদ, যুদ্ধ এবং প্রতিরোধের বস্তু তৈরি করা, স্থান-কাল অনুযায়ী যুদ্ধের সঠিক পরিকল্পনা করা, শত্রুর সারিতে টার্গেট নির্দিষ্ট করা, যুদ্ধের অবস্থার ব্যাপারে মিডিয়ায় প্রচার করা এবং আধুনিক যুদ্ধবিদ্যার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়াসহ বিভিন্ন ভাগ রয়েছে।

শত্রুরা বহুবার স্বীকার করেছে যে, ক্রুসেডার মিডিয়ার প্রভাবের তুলনায় মুজাহিদদের মিডিয়ার প্রভাব অনেক বেশি ও বিস্তৃত, যদিও মুজাহিদদের মিডিয়ার তুলনায় তাদের মিডিয়াসমূহ পরিমাণের দিক দিয়ে অনেক বেশি।

৩- সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রস্তুতিঃ- সন্দেহাতীতভাবে সাহিত্য ও সংস্কৃতি হচ্ছে প্রভাবশালী একটি মাধ্যম, যা মানুষের সুপ্ত অন্তরকে জাগিয়ে তোলে, দয়ার উদ্রেক করে এবং মানুষকে সাহসিকতা, ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট সহ্য করার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করে। এই উম্মাহ ততদিন পর্যন্ত সম্মানিত থাকবে যতদিন তারা মর্যাদার সংস্কৃতিকে গ্রহণ করবে এবং আত্মত্যাগ, কোরবানি ও স্বাধীনতার সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করবে।

তালিবানরা আল্লাহর সাহায্যে এই ক্ষেত্রেও বিশাল পরিমাণ প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হয়েছে। তাদের সামরিক, চিন্তাগত ও সাহিত্যিক অনেক কিতাব রয়েছে, যা মুজাহিদদের নতুন প্রজন্মকে প্রস্তুত করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে এবং আরো ছিল প্রায় পাঁচ হাজারের কাছাকাছি সুমিষ্ট কণ্ঠের উত্তম কথার জিহাদি নাশিদ বা সঙ্গীত, যেগুলোকে যুদ্ধ ও ত্যাগের ময়দানে মুজাহিদদের দৃঢ়তার ক্ষেত্রে বিশাল মানসিক শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। সেই সাথে এসব জিহাদি প্রভাববিস্তারকারী সাহিত্য ক্রুসেডারদের সামরিক ঘাঁটিগুলো থেকে ক্রুসেডারদের

প্রচারিত অশ্লীল গান বাজনায় মত্ত হয়ে চারিত্রিক বিপর্যয় থেকে আফগান নতুন প্রজন্মকে রক্ষা করেছে।

অন্যদিকে তালিবানদের যুদ্ধের ময়দানের কমান্ডারদের প্রস্তুতি অন্যান্য জামাত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ভিন্নতার একটি দিক হচ্ছে, তালিবানদের ময়দানের নেতৃত্বের সকলেই শরিয়তের ইলমের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত রাখে। হয়তো তারা শরিয়তের আলিম অথবা বিচারক অথবা মুফতি অথবা আল্লাহর কিতাবের হাফেজ অথবা শরিয়তের তালেবে ইলম। শরিয়তের ইলমের সাথে সম্পৃক্ত থাকার ফলে এটি তাদেরকে বিচ্যুতি অথবা বস্তুবাদের শিকার হওয়া থেকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে বড় ধরণের ভূমিকা রেখেছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্মানিত কিতাবে এই উপলব্ধি ইরশাদ করেন:

"নিশ্চয়ই তার বান্দাদের মাঝে আলিমরা আল্লাহকে (অধিক) ভয় করে" (সূরাহ ফাতির-২৮)।

সুতরাং ফিতনা প্রতিরোধ ও বিপদে দৃঢ়তার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম অন্যদের চেয়ে বেশি সক্ষমতা রাখেন।

ভিন্নতার আরেকটা দিক হচ্ছে, ময়দানের নেতৃত্ব তালিবানদের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না। এমন হয় না যে, তাদের মধ্য থেকে অন্যদের কাছে তা যায় না। বরং এটি অনেক বিস্তৃত একটি ক্ষেত্র, যেখানে কষ্ট ও ত্যাগ করতে ইচ্ছুক প্রত্যেকেই আসতে পারে। কারণ তালিবানদের মধ্যে নেতৃত্ব কোনো গনিমতের বিষয় নয় বরং তা হচ্ছে মৃত্যু,বন্দিত্ব,পালিয়ে বেড়ানো ও বিপদ-মুসিবতকে স্বাগত জানানো। এজন্য এর দিকে অগ্রসর হয় একমাত্র তারাই, যারা আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়। আর এসমস্ত বৈশিষ্ট্যের ফলে ময়দানের নেতৃত্বের জন্য এমন কিছু ঐকান্তিক মানুষকে রাখা হয়, একনিষ্ঠ যুবকরা জান প্রাণ দিয়ে যাদের পাশে টিকে থাকে এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ তিতিক্ষা পেশ করে তাদের আহবানে সাড়া দেয়।

১০.৬) বিশ্বের জিহাদি সংগঠন ও মুজাহিদিনদের ব্যাপারে তালিবানদের দৃষ্টিভঙ্গিঃ-

তালিবানরা সমস্ত বিশ্বের জিহাদি সংগঠনগুলোর একতায় বিশ্বাস করে। যেখানে ইসলাম, ইসলামি আকিদা ও ইসলামের জন্য কষ্ট ও কুরবানি করা, মুসলিমদের ভূমির প্রতিরোধ এবং আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা মুজাহিদদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবে। যেহেতু সবার দ্বীন এক, কিতাব এক, নবী এক, একই শত্রুর বিরূদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যদি একক ইসলামি শরিয়ত প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কোন জিনিস তাদেরকে বৈশ্বিক কুফুরি শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে বাঁধা দিচ্ছে। সত্য ও দ্বীনের জন্য প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সাহায্য,নসিহত, ধৈর্য এবং প্রতিরোধ যুদ্ধে একে অপরের পাশে টিকে থাকা থেকে কোন জিনিস তাদেরকে বাঁধা দিবে।

যদি অস্ট্রেলিয়ান ক্রুসেডাররা কানাডিয়ান ক্রুসেডারদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অবস্থান নিতে পারে, যদি পোল্যান্ডের ক্রুসেডাররা জর্জিয়ান ক্রুসেডারদের পক্ষে দাঁড়াতে পারে অথচ তাদের মাঝে অসংখ্য বিরোধ রয়েছে, তাহলে কেনো পৃথিবীর পশ্চিমপ্রান্তের মুজাহিদ পূর্বপ্রান্তের মুজাহিদ ভাইয়ের পাশে অবস্থান নিতে পারবে না?

নিশ্চয়ই ইসলাম এবং মুসলিমদের ভূমির প্রতিরোধের দায়িত্ব শুধু কোনো ব্যক্তি, দল বা রাষ্ট্রের কাজ নয়। এটি সেই আকিদা ও দ্বীনের পক্ষ থেকে দায়িত্ব যা মুসলিমদেরকে এক উম্মাহ বানিয়েছে।

“নিশ্চয়ই ইহা তোমাদের এক উম্মাহ এবং আমি তোমাদের রব, তাই আমার এবাদত কর” (সূরাহ আম্বিয়া-৯২)।

নিশ্চয়ই বর্তমানে শত্রুরা সকল মুজাহিদগণকে এক ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করছে। তারা আল্লাহর দ্বীনের পক্ষে প্রতিরোধকারী এমন সবার বিরুদ্ধে এক বৈশ্বিক ঐক্যজোট গঠন করেছে।

তাই আল্লাহর পথের মুজাহিদদের উপরও আবশ্যক হচ্ছে, তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে এক শক্তি হিসেবে তৈরি হওয়া। তারা একে অপরের সাহায্যে সেভাবে এগিয়ে আসবে যেভাবে আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ-

"যদি তারা দ্বীনি ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে,তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবেলা ব্যতীত" (সূরাহ আনফাল-৭২)।

তালিবানরা জিহাদি জামা'আতের মধ্যে একতার জন্য এই পরিমাণ কুরবানি করেছে, যার অনুরূপ গত শতাব্দীতে আর কেউ করেনি। তারা ওয়াদার উপর দৃঢ় রয়েছে এবং ধৈর্য, দৃঢ়তা ও দীর্ঘ পথে একইভাবে টিকে থাকার জন্য মুজাহিদদেরকে নসিহত করছে।

এটি হচ্ছে বর্তমান সময়ে জিহাদ এবং প্রস্তুতির ময়দানে তালিবানদের দৃষ্টিভঙ্গির কিছু আলোকপাত। আল্লাহর কাছে দু'আ করছি, যাতে তিনি তাদের কাজকে কবুল করে নেন এবং এই চিন্তাধারা যাতে শুধু চিন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে তা বাস্তবায়নে মুমিনদের মধ্যে থেকে তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে সীসা ঢালা প্রাচীরের মত সুদৃঢ় ঐক্যবদ্ধ হতে তাউফিক্ব দান করেন।

(আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে,যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর)

[সূরাহ আছ-ছফ-৪]।

*** উপরোক্ত আর্টিকেলটি আস-সমুদের যে ৫ টি সংখ্যায় রয়েছে, সে সংখ্যাগুলোর লিংক.....

[৪৪ তম সংখ্যার ১৮-২১ পৃষ্ঠা। লিংক... https://bit.ly/2GlRtm7

৪৬ তম সংখ্যার ১৮-২৩ পৃষ্ঠা। লিংক..... https://bit.ly/2IuC72q

৪৭ তম সংখ্যার ২০-২১ পৃষ্ঠা। লিংক..... https://bit.ly/2veSI1i

৪৮ তম সংখ্যার ৩৪-৩৭ পৃষ্ঠা। লিংক..... https://bit.ly/2Ut3Ba7

৪৯ তম সংখ্যার ৪-৯ পৃষ্ঠা। লিংক..... https://bit.ly/2IvdaE4]

** ৫ পর্বের আরবি আর্টিকেলটি একসাথে .... https://bit.ly/33TdKBK (৫.৫৫ এমবি)